মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী (অব:)

# দেশটা কেমন করে এমন হলো

স্বাধীনতাযুদ্ধের বীর সৈনিক মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী (অব.) এদেশের সবরকম সংকটজনক পরিস্থিতির মধ্যে নিজের সক্রিয় চিন্তার প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থটি তাঁর সেই সক্রিয় চিন্তার সংকলন। এতে অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলো দেশের শীর্ষস্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত। লেখক জনাব মইনুল হোসেন চৌধুরী কখনোই মনে করেন না যুদ্ধের ভেতর দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের পর কোনো যোদ্ধার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। বরং তার চেয়ে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশে যোদ্ধার দায়িত্ব হয় দেশগঠনে আত্মনিয়োগ করা, তিনি তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে ও আলোচনায় দেশগঠনের সেই দিকনির্দেশনা দিয়ে আসছেন।
তিনি সত্যি এক দূরদর্শী ব্যক্তি, তাঁর দূরদর্শী আগাম বক্তব্যের প্রতিফলন আমাদের জাতীয় জীবনে বারবার বাস্তবে রূপ নিয়েছে। সেই দিকটি বিবেচনায় রেখে এই গ্রন্থটির প্রকাশনা নিশ্চিতভাবেই একটি গুরুত্বের দাবি রাখে। প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায়—গ্রন্থটি এই সময়ের মূল্যবান দলিল হিসেবে স্বীকৃত হবে।

ISBN : 984 410 552 8
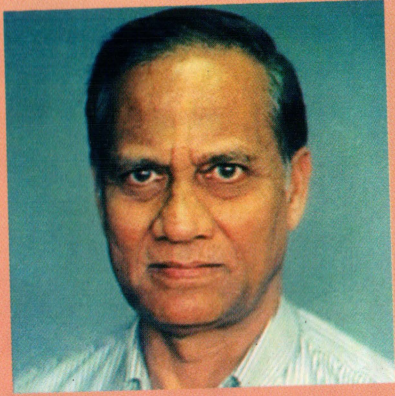
মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী (অব.) ১৯৪৩ সালে সিলেটে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬৪ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কমিশন লাভ করেন এবং ১৯৭০ সালে মেজর হিসেবে পদোন্নতি পান। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে জয়দেবপুরে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। পরে ১ম ও ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের নেতৃত্ব দেন এবং সাহসিকতার জন্য তিনি *বীরবিক্রম* খেতাব লাভ করেন। ১৯৭২-১৯৭৫ পর্যন্ত ঢাকা ব্রিগেড ও লগ এরিয়া-র অধিনায়ক এবং ১৯৭৬-১৯৭৭ পর্যন্ত জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থায় যুক্তরাজ্যে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৭৭-১৯৮১ পর্যন্ত সেনাবাহিনীর অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল ছিলেন। মাত্র ৩৭ বছর বয়সে মেজর জেনারেল হিসেবে পদোন্নতি পান। ১৯৮২ সালে তাঁকে ফিলিপাইনে প্রথম রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ করা হয়। দীর্ঘ ১৬ বছর বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। থাই সেনাবাহিনী জেনারেল মইনকে তাদের সম্মানসূচক স্পেশাল ওয়ারফেয়ার উইং প্রদান করে। ১৯৯৭ সালে তিনি অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো মনোনীত হন। ১৯৯৯ সালে তিনি সেনাবাহিনী হতে অবসর নেন। ২০০১ সালে তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। ২০০২-২০০৫ পর্যন্ত ইউএনডিপি ও বিশ্বখাদ্য কর্মসূচি সংস্থার উপদেষ্টা ছিলেন। লেখকের *এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য : স্বাধীনতার প্রথম দশক* বইটি পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে।

প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী

প্রকাশনার ছয় দশকে
মাওলা ব্রাদার্স


প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪১৩
ফেব্রুয়ারি ২০০৭

প্রকাশক
আহমেদ মাহমুদুল হক
মাওলা ব্রাদার্স
৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন ৭১৭৫২২৭ ৭১১৯৪৬৩
ই-মেইল mowla@accesstel.net

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

কম্পোজ
বাংলাবাজার কম্পিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড ৩য় তলা
ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
এস আর প্রিন্টিং প্রেস
৭ শ্যামাপ্রসাদ রায় চৌধুরী লেন ঢাকা ১১০০

পরিবেশক
সুবর্ণ
১৫০ বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম ঢাকা ১০০০

দাম
একশত পঁচিশ টাকা মাত্র

ISBN 984 410 552 8

DESHTA KEMON KORE EMON HOLO (a collection of articles) by Major General Moinul Hossain Chowdhury (Rtd.). Published by Ahmed Mahmudul Haque of Mowla Brothers 39 Banglabazar, Dhaka 1100. Cover Designed by Qayyum Chowdhury Price Taka One Hundred Twenty Five Only

উৎসর্গ

প্রিয় বাংলাদেশ

# ভূমিকা

আমি একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন যাপন করেছি। আজ পিছনে ফিরে তাকালে একটা আমি বলতে পারি। একে আত্মতৃপ্তিও হয়তো বলা যায়। তরুণ বয়সে চাকরিতে যোগ দিয়েছি মেধা ও প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে। মেধা, কঠোর পরিশ্রম, সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, দেশপ্রেম নিয়ে এগিয়ে যেতে চেয়েছি সারা জীবন। জীবনের সবক্ষেত্রে এসবকে পাথেয় করে চলেছিও। দৃঢ় বিশ্বাস, সৎসাহস আমাকে পিছন ফিরতে দেয়নি। আমার আত্মতৃপ্তি সেজন্য।

চাকরিজীবনে তৎকালীন পাকিস্তান এবং বর্তমান বাংলাদেশেও স্বীকৃতি পেয়েছি। যদিও সম্প্রতিক বাংলাদেশে দেশপ্রেমের অভাব, দেশ ও জনগণের স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপ, সামাজিক-চারিত্রিক মূল্যবোধের অধঃপতন এবং সুবিধাবাদীদের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। দেশের এই পরিস্থিতির কারণে আমাকেও কিছুটা মূল্য দিতে হয়েছে। তবে এর জন্য আমার কোনো আফসোস নেই, কারণ আমি আমার বিবেকের স্ফূলিঙ্গকে নিভে যেতে দিইনি। আমার ব্যক্তিগত অবস্থান যা ব্যবসা, বাণিজ্য এমনকি এনজিওদের সাথেও সম্পৃক্ত নয়। নিজের সাময়িক সুবিধার জন্য অনৈতিক কিছুর সঙ্গে সমঝোতা কিংবা বিবেকের সাথে কখনও গোপন সন্ধি করিনি। নৈতিকতার মহাসংকটে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা কঠিন কাজ। আমি সে কঠিন কাজটিও করার চেষ্টা করেছি। আর সেজন্য মানুষের ভালবাসা পেয়েছি, আমর তৃপ্তির জায়গাটা সেখানে। আমি সব সময় যশের চেয়ে চরিত্রকে গুরুত্ব দিয়েছি। কারণ চরিত্র হচ্ছে আমার নিজের প্রতিচ্ছবি। আর যশ হচ্ছে অন্যরা আমার সম্পর্কে কী ভাবেন তা। ৩৫ বছরের চাকরিজীবন পার করে এসেছি, আমি আমার বিবেককে দূষিত ও হাতকে নোংরা করিনি।

আর এই বিবেকের তাড়ানায় এবং বিভিন্ন সময় নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে আমি এই লেখা কটি লিখেছি। পাঠকদের কাছ থেকে সময় সময় প্রচুর

সাড়া পেয়েছি। আমি বিশেষজ্ঞ কিংবা নিয়মিত কলামলেখক নই। এইসব কলামে আমি শুধু আমার মনের কথা, আমার বিশ্বাসের কথা, আমার অভিজ্ঞতার কথা লিখেছি। যা বাস্তব ও সত্য তা লিখতে গিয়ে বুদ্ধিভিত্তিক অসততা কিংবা কোনোরূপ ভয়ভীতি আমাকে প্রভাবিত করেনি। কারো প্রিয়-অপ্রিয় হওয়ার ভাবনা আমার মধ্যে কখনও ছিল না, নেই। বিভিন্ন সময় প্রকাশিত এসব লেখা পাঠকদের ওই সময়ের বাংলাদেশকে সামান্য হলেও দেখাতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

জানুয়ারি ২০০৭ **মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী (অব.)**
ঢাকা

## সূচিপত্র

দেশটা কেমন করে এমন হলো ১১
বিনা কাজে বেতন, নাম তার দুর্নীতি দমন কমিশন ১৬
ত্রিভুজের মধ্যে আটকা পড়ে গেছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ২০
সামরিক অভ্যুত্থানের আশঙ্কা নেই বললেই চলে ২৬
অমাবস্যার রাতে কালো বিড়ালের খোঁজে ৩২
বিদ্যমান আইনেই নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব ৩৭
আসতে কাঁদেন যেতেও কাঁদেন ৪০
সন্ত্রাসের রাজনীতিকীকরণ ও রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন
সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচারের পথে অন্তরায় ৪৪
বাংলাদেশে গণতন্ত্র একটি প্রহসন ৪৭
গ্রেনেড হামলার ঘটনায় দেশের ভাবমূর্তি আরো ক্ষতিগ্রস্ত হবে ৫২
জেহাদিদের জঙ্গের ঢং ৫৯
এ কেমন দৈন্য ৬৪
'শৃঙ্খলা বাহিনী' অযোগ্য কেন? ৬৭
লেখাটি কেউ পড়লে খুশি হব ৭১
রাজনৈতিক সদিচ্ছা প্রয়োজন ৭৪
'গৃহযুদ্ধ, বিপ্লব নাকি জাতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধ' ৭৭
সেনা অভিযান ও আমাদের ভবিষ্যৎ ৮৫
'অকার্যকর রাষ্ট্র' নিয়ে কার্যকর আলোচনা! ৯০
ধীরে ধীরে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা হয় ৯৫
দায়মুক্তি নিয়ে আরো প্রশ্ন ৯৮
স্বাধীনতা গন্তব্য ছিল না ছিল জাতির যাত্রার প্রারম্ভ ১০০
যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য ভারত ও পাকিস্তানের সহযোগিতা প্রয়োজন ১০৪

# দেশটা কেমন করে এমন হলো

১৬ ডিসেম্বর ফিরে আসছে। স্বাধীন বাংলাদেশের ৩৩তম ১৬ ডিসেম্বর। আর কোথাও না গেলেও এখন পর্যন্ত বঙ্গভবনের সংবর্ধনায় যাই। এবারও যাব। আরও অনেকে যাবেন। তাঁদের সঙ্গে করমর্দন হবে, হাসি-বিনিময় হবে; হবে কথাও। এখন তো কেবল আনুষ্ঠানিকতা। কিন্তু মনের প্রকৃত অনুভূতি তো সেখানকার অনেকেই জানবেন না। সেই অনুভূতিটুকু পাঠকদের সঙ্গে আগাম বিনিময় করতে মন চায়।

একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর, প্রথম বিজয় দিবসেও ছিলাম এই বঙ্গভবনের আশপাশেই। ঢাকা স্টেডিয়ামে। দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের নিয়মিত বাহিনীর আট শতাধিক সদস্য নিয়ে ওইদিন সকালে ঢুকেছিলাম ডেমরায়। বিকেলে আস্তানা থেকে গাড়ি করে ঢাকা স্টেডিয়ামে। এই ডিসেম্বরে সেই ডিসেম্বরের দিকে তাকালে দেশের জন্য কষ্ট হয়। চোখের সামনে থেকে নয় মাস ধরে যারা একে-একে হারিয়ে গিয়েছিল তাদের মুখটা মনে এলে নিজেকে অতি ক্ষুদ্র মনে হয়। যারা বেঁচে গেছি, সেই ডিসেম্বরে তাদের সামনে ছিল স্বপ্ন, যা বাস্তব রূপ নেবে বলে দৃঢ়বিশ্বাসও ছিল। এই ডিসেম্বরের বাস্তবতা ভিন্ন, বলা যায় অনেকটা বিপরীত।

কেন জাতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধে গিয়েছিলাম? তিনটা বিষয় বলতে পারি। ক. সে-সময়ে সৃষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ, খ. তার থেকে সৃষ্ট ক্রোধের তীব্র অনুভূতি, গ. সৎসাহস। একজন আত্মপ্রত্যয়ী, আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন সামরিক কর্মকর্তা হিসেবে পাকিস্তানের অধীনে হামাগুড়ি দিয়ে চলা সম্ভব ছিল না। পেশাগত অভিজ্ঞতায় বুঝতে পেরেছিলাম পাকিস্তানিরা বাঙালিদের দাবিয়ে রাখতে সীমাহীন বর্বরতা চালাতে পিছপা হবে না। যেমনটা তারা করেছিল বেলুচিস্তানে জেনারেল টিক্কা খানের মাধ্যমে। এই অনুভূতি হয়তো সব বাঙালি অফিসারের মধ্যে ছিল। তবু বলতে হয়, ১৯৭১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বিভিন্ন পদে প্রায় ২০০ বাঙালি সামরিক অফিসার কর্মরত ছিলেন। তাঁদের অর্ধেকেরও কম জাতীয় স্বাধীনতার

যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। অথচ সেই ক্রান্তিলগ্নে তাঁদের প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশি।

বেসামরিক কর্মকর্তাদের বেলায় অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়। নয় মাসে প্রাদেশিক সরকারের সচিব থেকে শুরু করে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত পদবির বিপুলসংখ্যক বাঙালি কর্মকর্তার বড়জোর ১৫ ভাগের মতো বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছিল। আবার যাঁরা বিভিন্ন মিশনে কূটনীতিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন তাঁদের মধ্যে হাতেগোনা কয়েকজন কর্মকর্তা বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশ করেন। এ-ব্যাপারে প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত তাজউদ্দিন আহমদের কাছে শুনেছি—দেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের আগে অনেক কূটনীতিক ও বিদেশে চাকরিরত বাঙালি অফিসার তাঁর কাছ থেকে ভরণ-পোষণের নিশ্চয়তা আদায় করেছিলেন এবং সেটা লিখিত দিতে তিনি বাধ্য হন।

লে. জেনারেল জেকব তাঁর বই 'বাংলাদেশ বার্থ অব অ্যা নেশন'-এ অনেকটা কটাক্ষ করে বলেছেন, প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার ও ভারত সরকার ভরণ-পোষণ ও ছেলেমেয়েদের পড়ালেখার খরচ চালানোর লিখিত অঙ্গীকার দেয়ার পর অনেক কূটনীতিক বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।

এবার আসুন পুলিশে। প্রথম সারির পুলিশ কর্মকর্তাদের খুব কমই স্বাধীনতার পক্ষে অংশ নেন। বলতে গেলে এ-সংখ্যা হাতে গোনা যায়। '৭১ সালে নেতৃত্বের অভাবে পুলিশের সাধারণ সদস্যদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

এসব বলার উদ্দেশ্য কাউকে হেয় করা নয়। পাঠকদের এটা বলতে চাই যে, আমাদের অনেকের মধ্যে 'টোটাল ফেইথ অ্যান্ড কমিটমেন্ট' ছিল না। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এরা-আমরা সবাই সরকারের অংশ হয়েছি। বর্তমানে বাংলাদেশের যে-অবস্থা তার জন্য এই আমরা-তারা সবাই দায়ী। কিন্তু সবচেয়ে বেশি দায়ী যাঁরা গত ৩২ বছর দেশ পরিচালনায় নেতৃত্ব দিয়েছেন। ৩২ বছর পর আজ এই ডিসেম্বরে পেছন ফিরে তাকালে কোনোকিছু আর মিল খায় না। আমরা এখন এমন একটা সিস্টেমের অংশ, যা আমরা নিজেরাই অপছন্দ করি।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দিগন্তে গৃহযুদ্ধ, বিপ্লব, অভ্যুত্থান অথবা বহিঃশত্রুর আক্রমণের কোনো আভাস এই মুহূর্তে দেখছি না। তথাপি এটা বলা অতিরঞ্জিত হবে যে, দেশে সবকিছু ভালোভাবে চলছে এবং চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। বস্তুত আমাদের ভবিষ্যৎ এখন 'ভয়ের বসতি'। অতীতকে নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু থাকে না। তবুও অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যৎ নিয়ে মানুষ চিন্তিত হয়। এর মধ্যে বর্তমান যদি হয় হতাশার তবে ভবিষ্যৎ ভীতিকর বলে মনে হয়। মনে রাখতে হবে, ভয় ও ভবিষ্যৎ দুটোর অবস্থানই সময়ের দিক থেকে সামনে। আর এটাই মানুষকে হীন ও দুর্বল করে তোলে।

ভয় ও ভবিষ্যৎ মানুষের সঙ্গে একধরনের ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। যারা সাহসী, বিবেকবান ও সৎ তাঁরা ইতিবাচক প্রক্রিয়ায় এই ষড়যন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন। আর যারা ভীতু, অসৎ তারা যায় নেতিবাচক দিকে। তারা নানা বেপরোয়া

ও অনৈতিক পদক্ষেপ নেয় সমাজ বা রাষ্ট্রের সৃষ্ট অনিশ্চিত ভবিষ্যৎকে তথাকথিত নিশ্চয়তা দান করতে। এটাই হলো দুর্নীতির পেছনের অন্যতম কারণ। বাংলাদেশে এখন এই দুর্নীতিবাজদের সাহস ও তৎপরতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, যাঁরা সৎ, দেশপ্রেমিক তাঁদেরই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হয়। এই সুটকোট পরা দস্যুদের হাতে সাধারণ জনগণ জিম্মি।

ইংরেজিতে একটি কথা আছে 'ফ্রম ইগনোরেন্স আওয়ার কমফোর্ট ফ্লোজ'। মানে, না জানলে আরামে থাকা যায়। আরেকটা প্রবাদ না বলে পারছি না— 'রেচিড আর দ্য ওয়াইজ'। মানে, যারা বোঝে এবং জানে তারা হতভাগা। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই 'হতভাগা'দের একটা অংশ নিজেদের এই বলে সান্ত্বনা দিচ্ছে যে, 'চিয়ার আপ, দা ওয়াস্ট ইজ ইয়েট টু কাম।'

যদিও আইন-শৃঙ্খলা ও দুর্নীতি পরস্পর সম্পূরক তবু এই লেখায় আমি আর আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে আলাদা কিছু বলব না। এটুকু সবাই জানেন, সাধারণ লোকজন যদি বুঝতে পারেন প্রশাসন, সরকার ও সমাজের উঁচুস্তরের লোকজন নৈতিক ও আর্থিক দুর্নীতিতে নিমজ্জিত তখন সাধারণ ছোটখাটো অপরাধীরাও তাদের স্তর থেকে কিছু করার জন্য বাহ্যিকভাবে চেষ্টা চালায়। এই প্রচেষ্টা যখন বাধাগ্রস্ত না হয় তখন তারা আস্তে আস্তে বেপরোয়া হয়ে ওঠে এবং বড় অপরাধীতে পরিণত হয়। দুর্নীতি ও উচ্ছৃঙ্খলতা সমাজের সব স্তরে ছড়িয়ে পড়ে। সর্বনিম্ন পর্যায়ে এসে এটা ছিনতাই-রাহাজানির রূপ নেয়। আর তাতেই আইন-শৃঙ্খলা তথা দেশের সার্বিক কাঠামো নাজুক হয়ে পড়ে।

সিঙ্গাপুরের একটি ঘটনার কথা বলতে পারি। ১৯৮৬ সাল, আমি সেখানে বাংলাদেশের হাইকমিশনার। সেদেশের অত্যন্ত প্রভাবশালী উন্নয়নমন্ত্রী তে চ্যাং ওয়ানের বিরুদ্ধে আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগ ওঠে। বলা হয়, তিনি একটা ডেভেলপার কোম্পানির কাছ থেকে ৮ লাখ ডলার ঘুষ নিয়েছেন। মন্ত্রী থাকা অবস্থায়ই তাঁকে করাপ্ট প্র্যাকটিসেস ইনভেস্টিগেশন ব্যুরোর (সিপিআইবি) তদন্তের সম্মুখীন হতে হয়। তিনি অভিযোগ অস্বীকার করেন। তবে তিনি বিষয়টি নিয়ে তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচর প্রধানমন্ত্রী লি কোয়ান ইউর সঙ্গে দেখা করতে চান। প্রধানমন্ত্রী তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর এই ঘনিষ্ঠ সহচরের সঙ্গে দেখা করবেন না বলে জানান। এরপর তে চ্যাং প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে একটি চিঠি লিখে রেখে আত্মহত্যা করেন। চিঠিতে তিনি লিখেছেন, 'আমি পুরো পরিস্থিতির জন্য নিজেকেই দায়ী করছি এবং একজন আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে এ-ভুলের জন্য আমি সর্বোচ্চ শাস্তি বেছে নিলাম।' সিঙ্গাপুরের পত্রপত্রিকায় লেখালেখি হয়, এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছিল যা তে চ্যাংকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করেছিল।

ঠিক এভাবে অস্ট্রেলিয়ায় দেখেছি, টিএডিএ বিলে কয়েকশ ডলারের গরমিলের জন্য একটি স্টেটের মুখ্যমন্ত্রীকে জেল খাটতে হয়েছে। আবার পার্লামেন্টের এক সিনেটরকে পদত্যাগ করতে হয়েছে সরকারি গাড়ির অপব্যবহারের জন্য।

পৃথিবীর সব দেশেই দুর্নীতি হয়। উল্লিখিত দেশগুলোতেও হচ্ছে। কিন্তু শাস্তির ঘটনাগুলোয় দেখবেন যাঁরা শাস্তি পেয়েছেন তাঁরা সবাই উচ্চ পর্যায়ের।

নিয়মও তা-ই। দুর্নীতি বন্ধ করতে হয় ওপরের স্তর থেকে। কিন্তু আমাদের দেশে সব উলটো। দুর্নীতি কিংবা আইন-শৃঙ্খলার কোনো ঘটনা ঘটলে বড়জোর পুলিশের ওসি ক্লোজ। প্রশাসনিক অনিয়ম হলে ম্যাজিস্ট্রেটকে বদলি। ব্যস! কিন্তু এতে শুধু সময়ের অপচয়ই হয়, দুর্নীতি বন্ধ হয় না। উপরের পর্যায়ের লোকজনের দুর্নীতির কোনো শাস্তি আমাদের দেশে হয় না বললে চলে। আমাদের আইন শুধু গরিবদের রগড়ায়।

আমি আমার বিভিন্ন লেখায় বিশেষ করে আইন-শৃঙ্খলাবিষয়ক লেখায় (অপারেশন ক্লিন হার্ট-পরবর্তী সময়ে) সামরিক বাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কর্মকাণ্ডের তীব্র সমালোচনা করেছি। এ-লেখায় সেনাবাহিনীর একটা ভিন্ন চিত্র তুলে ধরছি। গত ১০ বছরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রায় ১০ জন মেজর জেনারেল (সচিবের সমমর্যাদার পদ), ১৬ জন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, ২২ জন কর্নেল দুর্নীতির জন্য আমার জানামতে চাকরিচ্যুত হয়েছেন। এর নিচের পর্যায়ের অনেক অফিসারের শাস্তি হয়েছে ও হচ্ছে। সদ্য জানতে পেরেছি ৭ লাখ টাকা তসরুপের জন্য একজন ক্যাপ্টেনের জেল হয়েছে—যদিও আমি মনে করি, শুধু চাকরিচ্যুতি নয়, দুর্নীতির জন্য কোর্ট মার্শাল হওয়া উচিত এবং শাস্তি-পাওয়াদের নাম জনগণকে জানানো উচিত।

কিন্তু বেসামরিক প্রশাসনে গত ১০ বছরে কোনো সচিব (মেজর জেনারেল পদমর্যাদার), যুগ্মসচিব, অতিরিক্ত সচিব অথবা কোনো মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা রাজনৈতিক নেতার দুর্নীতির জন্য শাস্তি হয়েছে বলে আমার জানা নেই। যদি হয়ে থাকে তবে তাও দেশবাসীকে জানানো দরকার। তা হলে কি ধরে নেব যে, শুধু সামরিক বাহিনীর দুর্নীতির কারণেই বাংলাদেশ পরপর তিনবার এক নম্বর দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে? যদি তা না হয়, তা হলে দুর্নীতির বেলায় সামরিক ও বেসামরিক লোকদের ব্যাপারে আইনের প্রয়োগ ভিন্নতর হবে কেন?

পত্রপত্রিকায় সীমিত আকারে কিছুকিছু মন্ত্রী-এমপি ও সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ও তথ্য প্রকাশ পায়। কিন্তু পরে আর এসবের কোনো হদিস পাওয়া যায় না। খুব বেশি হলে জানা যায়, সাবেক কোনো কোনো মন্ত্রী বা এমপির বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা হয়েছে। কদিন পর শোনা যায়, তাঁর বা তাঁদের অন্তর্বর্তীকালীন জামিন (অ্যান্টিসিপেটরি বেইল) হয়েছে।

যতটুকু জানি, অ্যান্টিসিপেটরি বেইল একটা কনভেনশন (রীতি); কোনো আইন নয়। সাবেক প্রধান বিচারপতি এটিএম আফজল তাঁর এক রায়ে বলেছেন, অ্যান্টিসিপেটরি বেইল ইজ অ্যান একসেপশন টু দা জেনারেল ল অ্যান্ড কোর্ট উইল অলওয়েজ মাইন্ড দা কশন অব। বিশেষ কারণে এই জামিন দেয়ার ক্ষমতা বিচারকদের আছে। প্রশ্ন হচ্ছে—দুর্নীতি কি বাংলাদেশে বিশেষ ঘটনা?

দুটো ঘটনার কথা বলব, শুনলে আপনারও মনে হবে দুর্নীতি আসলেই একটা বিশেষ কর্ম। ইদানীং দুর্নীতি দমন কমিশন করা নিয়ে নানা আলোচনা হচ্ছে।

উপস্থাপনাটা এমন যে, এটা হলে দুর্নীতিবাজদের শাস্তি হবে, দুর্নীতি বন্ধ হয়ে যাবে। ব্যক্তিগত পর্যায়ের আলোচনায় আমি পরিচিতদের সরকারি কর্ম কমিশনসহ (সম্প্রতি প্রশ্নপত্র ফাঁসের জন্য আলোচিত) বিভিন্ন কমিশনের কথা স্মরণ করিয়ে দিই। অভিযোগ আছে, সরকারের কয়েকজন বড় কর্মকর্তা চাকরির সময় দেয়া জীবনবৃত্তান্তে ভুল তথ্য দিয়েছেন, যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। পত্রিকায়ও তা প্রকাশ হয়েছে। কিন্তু কোনো প্রতিকারের কথা শুনি নি। তবে প্রমোশন দিয়ে আরও বড় পদ দেয়া হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে।

আরেকটি বড় অফিসের নির্বাহী প্রধানের বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণপত্রসহ বিভিন্ন পত্রিকায় বড় বড় করে খবর ও সম্পাদকীয় বেরিয়েছিল। সেই অফিসের মাধ্যমে দেশের জন্য অতি প্রয়োজনীয় বিদেশী বিনিয়োগ আসে। তার প্রধানের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি সরকারি চাকরিতে (চুক্তিভিত্তিক) কর্মরত অবস্থায় একটি বেসরকারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে মাসে মাসে বিপুল পরিমাণ টাকাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নেন। সরকারি চাকুরে হয়েও তিনি ওই বেসরকারি কোম্পানির অফিস-আদেশ সই করেন। এটা সংশ্লিষ্ট কোম্পানিকে বিশেষ সুবিধা দেয়ার জন্য ঘুষ অথবা কোম্পানির বিশেষ অসুবিধাকে পুঁজি করে ব্ল্যাকমেইল করাও হতে পারে। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করেছিলাম দেশের দুর্নীতির কলঙ্ক কিছুটা হলেও মোচন করতে এবং সরকারের অবশ্যকরণীয় হিসেবে এই কর্মকর্তাকে দ্রুত অব্যাহতি দেয়া হবে এবং অভিযোগ তদন্তের ব্যবস্থা করা হবে। বাংলাদেশের অবস্থা বিবেচনা করে বিকল্প ভাবনা ছিল, অচিরেই শেষ হতে যাওয়া তাঁর চুক্তি আর নবায়ন হবে না। কিন্তু বিস্মিত হয়ে দেখলাম, তাঁর চুক্তির মেয়াদ দ্রুত আরও দুবছর বাড়ানো হয়েছে। এরপর কষ্ট করে দুর্নীতি দমন কমিশন করার দরকার আছে বলে আমার মনে হয় না। এ-ধরনের কর্মকর্তাদের সম্পর্কে সরকার ও সমাজের কাছে প্রশ্ন, তাঁরা কী ভাবেন। তাঁরা কি ভাবছেন যে, এদের রাখা প্রয়োজন, কারণ তারা আমাদের সিস্টেমে ভালো 'ফিট' হন!

আমাদের দেশে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সভাসমিতিতে খই ফোটে। যার বিরুদ্ধে একগাদা দুর্নীতি অসততার অভিযোগ সেও দুর্নীতি বিষয়ে দেশবাসীকে নসিহত দেয়। মার্টিন লুথার কিং বলেছিলেন, কী বলা হচ্ছে তা গুরুত্বপূর্ণ নয়, কে বলেছে সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। এ-প্রসঙ্গে লরেন্স জে পিটারের Why things go wrong বই থেকে একটা গবেষণা তুলে ধরছি। জে পিটার একবার ব্রিটিশ কলাম্বিয়ায় একটি জেলে চুরির দায়ে ১৯ থেকে ২৩ বছর সাজাপ্রাপ্ত কয়েদিদের ক্লাস নিচ্ছিলেন। তিনি তাদের '      ইজ দ্যা বেস্ট পলিসি' বাক্যটি দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করতে বলেন। চোর-কয়েদিরা সবাই সঠিক জবাব দেন। তাঁরা লিখেছিলেন 'অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি।'

শেষে বলব—"অমঙ্গলের মধ্যে মঙ্গল সন্ধান করার মতো বোকামির অবসান ঘটে ধ্বংসের মাধ্যমে।"

*প্রথম আলো* ১৫ ডিসেম্বর ২০০৩

# বিনা কাজে বেতন, নাম তার দুর্নীতি দমন কমিশন

*'জাতির সুখ বা দুর্দশা তাদের স্বভাবের ওপর নির্ভর করে, পরিস্থিতির ওপর নয়।'*
*—মার্থা ওয়াশিংটন*

দুর্নীতি নিয়ে লেখা ও কথা বলার জন্য আমাকে নানা সময় নানা জন ও প্রতিষ্ঠান থেকে অনুরোধ করা হয়। বিশেষ করে দুর্নীতি দমন কমিশন গঠনের পর এর সদস্য, তাদের কাজ ইত্যাদি নিয়ে বলা ও লেখার অনুরোধ ছিল। আমি ইচ্ছাকৃতভাবে এ নিয়ে কথা বলি নি। তার প্রধান কারণ এই কমিশনের জন্য আমার নামও প্রস্তাব করা হয়েছিল। আমি সবিনয়ে তাতে অসম্মতি জানিয়েছিলাম। তারপরও নাম প্রস্তাবের জন্য করা কমিটির সুপারিশে আমার নাম রাখা হয়। আমার না করার কারণ সংশ্লিষ্টরা ভালোই জানেন। তাই যাঁরা ভেতরের খবর জানেন না, দুর্নীতি দমন কমিশন নিয়ে লিখলে তাঁরা হয়তো ভাবতে পারেন 'আঙুর ফল টক'।

কিন্তু দেশের সার্বিক অবস্থা ও বিবেকের তাড়নায় এখন কিছু কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি। এই দেশটি যে আপাদমস্তক দুর্নীতিতে নিমজ্জিত এটা বলা এক ধরনের 'পুনরাবৃত্তি'। আর বারবার এক বিষয় বললে তার গুরুত্ব থাকে না। ১৯৮২ সাল থেকে '৮৬ সাল পর্যন্ত ফার্দিনান্দ মার্কোসের ফিলিপাইন এবং সুহার্তোর ইন্দোনেশিয়ায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করেছি। সে-সময়ে দেশ দুটি দুর্নীতির জন্য বিশ্বে ব্যাপক আলোচিত ছিল। পরে যখন অস্ট্রেলিয়াসহ অন্য দেশে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করি, তখন বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক সহকর্মীসহ অন্যরা ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়ার দুর্নীতি সম্পর্কে আমার মন্তব্য শুনতে আগ্রহ দেখাতেন। এমন নয় যে, তখনকার বাংলাদেশের দুর্নীতি সম্পর্কে তাঁরা জানতেন না। তাঁরা শুধু ভদ্রতার খাতিরে ওই দেশ দুটির সঙ্গে মিলিয়ে আমার দেশ সম্পর্কে বলতেন না। অবশ্য আমি আলোচনায় আমার দেশকেও নিয়ে আসতাম। আমি সব সময় একটাই মন্তব্য করতাম, 'বাংলাদেশে টেবিলের নিচ দিয়ে ঘুষ দিতে হয়,

ফিলিপাইনে টেবিলের উপর দিয়ে, আর ইন্দোনেশিয়ায় টেবিলের উপর টাকা রাখলে ঘুষ গ্রহণকারী বলে, টেবিল ইজ অলসো মাইন! (অর্থাৎ টেবিলটাও আমার)।' এ-মুহূর্তে বাংলাদেশ কোন পর্যায়ে আছে তা পাঠক আমার চেয়ে ভালো জানেন। শুধু এটুকু বলতে পারি, আমাদের জিএনপির (বার্ষিক জাতীয় আয়) এক-তৃতীয়াংশ ঘুষ, অবৈধ ব্যবসা-কমিশন ও চাঁদাবাজির দান!

বাংলাদেশে দুর্নীতি হলো আবহাওয়ার মতো। এটা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা হয়; কিন্তু দুর্নীতি তার নিজের গতিতে চলে। আমরা যেমন আবহাওয়ার ক্রীড়নক, তেমনি দুর্নীতিরও। 'এনজিওনাইজেশন' ও 'সেমিনারাইজেশন' এতে কোনো প্রভাব ফেলতে পারে নি। উল্টো এসব নিয়েও নানা প্রশ্ন উঠছে। যেমন বলা হয়, 'পভার্টি এলিভিয়েশন থ্রু প্রফিট মেকিং' (লাভের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন) হচ্ছে এনজিওগুলোর কাজ।'

আমরা মনে করতে চাই, এই ভয়ঙ্কর অপমানজনক আত্মহননকারী পরিস্থিতি থেকে দেশকে মুক্ত করতে আপাতদৃষ্টিতে দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করার উদ্যোগ নেয়া হয়। অবশ্য অনেকে মনে করেন, দাতাদের চাপের মুখে যেনতেনভাবে জোড়াতালি দিয়ে নামমাত্র একটা কমিশন করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য দুর্নীতি দূর করা কি না সে-প্রশ্নও উঠছে।

আমি, আপনারা তো জানিই, তার চেয়ে বেশি জানেন যাঁরা দেশ পরিচালনা করেছেন ও করছেন। আজকের বাংলাদেশের অর্থনৈতিক দুর্দশা এবং ধনী-দরিদ্রের আকাশ-পাতাল দূরত্বের মূলে প্রথম ও শেষ কারণ একটি গোষ্ঠীর সীমাছাড়া দুর্নীতি। অর্থবরাদ্দ, অর্থব্যয়, প্রকল্প অনুমোদন, কর আদায়, অফিস-আদালত, সরকারি নিয়োগ-বদলি, ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে শুরু করে হেন কোনো ক্ষেত্র নেই, যেখানে খোলামেলাভাবে দুর্নীতি হয় না।

এ-অবস্থায় দুর্নীতি দমন কমিশনের মতো একটা প্রতিষ্ঠান চালাতে হলে চাই গর্বিত আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, অভিজ্ঞ, সৎ, আত্মত্যাগী, সাহসী, নির্লোভ ও চরিত্রবান দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তির। শুধু সুযোগ-সুবিধাসহ অবসর জীবন আরামে পার করার মতো চাকরি বা পদ—এটি হওয়া উচিত নয়। দুনিয়ার সব জায়গায় জনগণের তথা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের তিনটি মূলনীতি মেনে চলা বাধ্যতামূলক। তা না-মানা অর্থনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অসততা। এক. সততার সঙ্গে আইনানুগ কর্তব্য পালন। দুই. জনগণের স্বার্থের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ভয়ভীতি ও পক্ষপাতহীনভাবে নিজের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব শতভাগ পালন করা। তিন. নিজের প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা ক্ষুণ্ন ও সহকর্মীদের অবমাননা হয় এমন কোনো কাজ না করা।

আমার সবিনয় প্রশ্ন, দুর্নীতি দমন কমিশনের সদস্যরা কি এটা পালন করতে পারছেন, না শুধু এই হতদরিদ্র জনগণের কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা আর সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছেন? যদি উদ্দেশ্য থাকে যেকোনো মূল্যে চাকরি বজায় রাখা, চেয়ার ধরে রাখা, তা হলে কেউই কখনো তাঁর ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব সৎভাবে পালন করতে পারবেন না। আর এতে দেশ-জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। দুঃখজনকভাবে এই প্রবণতার

কারণে উচ্চ পর্যায় বিশেষ করে কয়েকটি বিভাগ ও কমিশন জনসমালোচনার মুখে পড়েছে।

বর্তমানে একটা মজার প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। যারা দুর্নীতি করে পাহাড়সমান সম্পদ দেশে-বিদেশে জড়ো করেছেন, তাঁদের অনেকে এখন সভা-সেমিনার ও পত্রপত্রিকায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে বলছেন ও লিখছেন। এসব লোকের অতীত যাঁরা জানেন তাঁরা বুঝতে পারেন একধরনের 'নৈতিক সাম্য' অর্জন কিংবা আরও সুযোগ-সুবিধাপূর্ণ অবস্থান এবং তাঁদের অসৎপথে অর্জিত ধনসম্পদ রক্ষা করাই উদ্দেশ্য। দুর্নীতি দমন নয়, অসদুপায়ে অর্জিত সম্পদকে সুরক্ষা দেয়া এবং সমাজে একটা সম্মানজনক অবস্থান তৈরি করাই তাঁদের মূল লক্ষ্য। আমরা সাধারণ মানুষ তাঁদের এই চিড়াভেজানো কথায় মুগ্ধ হই। কিন্তু বুঝতে পারি না 'থিফ শাউটিং ক্যাচ থিফ' (চোর, চোর ধরার জন্য চিল্লাচ্ছে!) টেলিভিশন ও পত্রপত্রিকা জেনে না-জেনে এ স্যুটকোট আর সিল্ক মসলিনের পাঞ্জাবি-পরা চোর-ডাকাত ও চাঁদাবাজদের আমাদের 'হেদায়েতের সুযোগ' করে দেয়। মিডিয়ার মূলমন্ত্র হওয়া উচিত 'ইন গড উই ট্রাস্ট, আদারস উই ভেরিফাই' (শুধু স্রষ্টায় বিশ্বাস করি, অন্য সবকিছু তদন্তসাপেক্ষ)।

আরেকটা বিষয় দেখা আমাদের জন্য জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কী বলা হয়েছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, কে বলেছে সেটা দেখতে হবে। তার অতীত ও বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে কথার মিল না থাকলে বুঝতে হবে সে যা বলছে, তা নিজেও বিশ্বাস করে না। দুর্নীতি দমন করার প্রচারণা থেকেও এসব লোককে দূরে রাখতে হবে। কারণ এরা দুর্নীতি দমনের প্রক্রিয়াকে জটিল করে ফ্যেলে। আর এ কারণে যারা দুর্নীতিতে জড়িত তারা আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে।

অনেক আলোচিত ও প্রত্যাশিত দুর্নীতি দমন কমিশন ২০০৪ সালের নভেম্বরে গঠিত হয়েছিল। এই গঠনপ্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিল, পরে যা আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। সূচনাতেই শুরু হয়েছিল নানা নাটক, ১৯ মাস ধরেই যা চলছে ধারাবাহিকভাবে। মাঝেমধ্যে অবশ্য শোনা গেছে দুর্নীতি দমনের হুমকি-ধামকি; অবশ্য তা চুনোপুঁটিদের নিয়ে। একবার সরকারি গাড়ি চুরি ধরার বিষয়ে আশাবাদী হয়েছিলাম; কিন্তু পরে কোনো-এক অজ্ঞাত কারণে তাঁরা চুপসে গেলেন। নাইকোর গাড়ি-কেলেঙ্কারি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ১৮ কোটি টাকার অনুদান দুর্নীতির ব্যাপারেও দু-একটি কথা শুনেছিলাম; কিন্তু এখন সেক্ষেত্রেও কমিশনের নীরবতা আমাদের ভাবিয়ে তুলছে। এক্ষেত্রে আমার মনে পড়ে যায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দুর্ধর্ষ জেনারেল প্যাটনের (যাঁর নামে বিখ্যাত প্যাটন ট্যাঙ্ক) একটি কথা। বেসামরিক সংস্থা সম্পর্কে তিনি একবার বলেছিলেন, "এগুলো হচ্ছে ভাঙা কামানের মতো, যা দিয়ে কোনো কাজ হয় না, গোলা নিক্ষেপ করা তো দূরের কথা।"

পাঠকদের উদ্দেশে বলতে চাই, যদি আমার বক্তব্য বেশি রূঢ় হয়ে যায়, তার কারণ হতে পারে দুটি। একটি হচ্ছে, এদেশের জন্য অজানা গন্তব্যে ৯ মাস যুদ্ধের মাঠে জীবন বাজি রেখে চলতে হয়েছে। অন্যটি হচ্ছে, যেখানে দেশের শতকরা

৭৭ ভাগ মানুষের মাথাপিছু আয় ১২০ টাকার কম, তার মধ্যে আবার ২৮ ভাগ ৬০ টাকা। ৩ কোটি লোক একবেলা খাবার জোগাতে হিমশিম খায়—এ-পরিস্থিতিতে ষাটোর্ধ্ব বয়সের চাপে দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে গিয়ে উৎকণ্ঠিত ও হতাশ হয়ে পড়ি।

দুর্নীতি দমন কমিশন সম্পর্কে তাই আর দু-একটি কথা বলা দরকার। কমিশনারদের উদ্দেশে বলতে চাই, দেশের দুর্নীতি দূর করতে হলে শুরু করতে হবে উপর থেকে। চুনোপুঁটি কাস্টমস বা পুলিশ কর্মকর্তার পেছনে না গিয়ে, পরিষ্কারের কাজটি করতে হবে তাঁদের দিয়ে যারা দেশ পরিচালনার দায়িত্বে আছেন বা ছিলেন, তা না হলে এটি শুধু সময়ের অপচয়ই হবে। সিঙ্গাপুরের উদাহরণটাই তুলে ধরা যায়, যেখানে দুর্নীতি উচ্ছেদের কাজটি শুরু করা হয়েছিল মন্ত্রী-এমপি ও রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার মধ্য দিয়ে। এর শুরু হয়েছিল ১৯৬০ সাল থেকে, যার ধারাবাহিকতায় ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বরে উন্নয়ন মন্ত্রী তে চেং ওয়ান দুর্নীতির তদন্তের সময় আত্মহত্যা করেন। তিনি ছিলেন মন্ত্রিসভার অন্যতম সিনিয়র মন্ত্রী এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিউ কান ইউর ঘনিষ্ঠজন। কিন্তু দুর্নীতির বিরুদ্ধে লিউ কান ইউ ছিলেন অত্যন্ত আপসহীন ও নির্দয়।

দেশের দরিদ্র জনগণের শ্রম ও ঘামের টাকায় আপনাদের বেতন এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা জোগানো হচ্ছে, সেই কমিশনে বসে পুরনো গাড়ি থাকা সত্ত্বেও এক বছরের মধ্যে তিনটি নতুন নিশান কার কেনা এবং সেই গাড়ির দাম পরিশোধে নিজেদের মনোমালিন্য আর অফিস, সচিব, জনবল ও বিধিবিধানের বিতর্কে আপনারা কেন মূল্যবান সময় নষ্ট করছেন? দেশ সর্বগ্রাসী দুর্নীতির কবলে নিমজ্জমান। সরকারের সঙ্গে যদি এ নিয়ে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকে, তা হলে সেটা ফয়সালা করুন নতুবা এ-পরিস্থিতিতে আপনারা বিবেকের তাড়নায় সড়ে দাঁড়ান। কেননা আপনাদের কোনো নৈতিক ও আইনগত অধিকার নেই দেশকে আরও দুর্নীতিতে নিমজ্জিত করার। আপনারা হয়তো বলবেন, আমরা তো অনেক মামলা করেছি। কিন্তু দেশের একজন নাগরিক হিসেবে আমার প্রশ্ন, সেসব মামলার প্রায় সবই কেন উচ্চ আদালতের নির্দেশে স্থগিত হয়ে যাচ্ছে? আর এসব মামলায় কমিশনের কত টাকা আইনজীবীদের পকেটে যাচ্ছে?

সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতি, অপশাসন ও প্রশাসনের অদক্ষতার কারণে জনগণ এখন স্বাভাবিক শ্বাস নিতেও কষ্ট পাচ্ছে। এ-কারণে ইতোমধ্যেই জনগণের আকস্মিক ফুঁসে ওঠা আমরা বিভিন্ন জায়গায় প্রত্যক্ষ করেছি। এটা যে দেশের ভবিষ্যতের জন্য কোনো ভালো ইঙ্গিত নয়, তা প্রেসিডেন্ট রবার্ট কেনেডির ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, "মানুষ যখন আইন হাতে তুলে নেয়, তখন পরাজিত হয় আইন; যখন আইন পরাজিত হয় তখন স্বাধীনতা লাঞ্ছিত হয়।" একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এটাই আমার জন্য যন্ত্রণাদায়ক ও হতাশার কারণ।

*প্রথম আলো* ৬ জুলাই ২০০৬

# ত্রিভুজের মধ্যে আটকা পড়ে গেছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার

**প্রথম আলো** *এটা বিজয়ের মাস। দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি অপ্রত্যাশিত রকমের নেতিবাক। আপনার অনুভূতির কথা বলুন।*

**মইনুল হোসেন চৌধুরী** ডিসেম্বর মাসে সব সময়ই আমি একটু স্মৃতিকাতর থাকি। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ঘটনা মুক্তিযুদ্ধ। আজ যে দিনটিতে আপনার সঙ্গে আমি কথা বলছি, মানে ৬ ডিসেম্বর, এ দিনটিতে আমি যুদ্ধে ছিলাম। ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার শাহবাজপুরে সম্মুখযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর ১২ এফএফ ব্যাটালিয়নকে মোকাবিলা করছিলাম। আমরা জানতাম না পরের মুহূর্তে কী ঘটতে পারে। আজ অস্ত্রের যুদ্ধ শেষ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আমার মনের ভেতর এক নীরব যুদ্ধ চলছে। তোলপাড় চলছে। এই বাংলাদেশ কি আমরা চেয়েছিলাম? বর্তমানে দেশে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে, এমনটা হবে তা কোনোদিনই আশা করি নি। একাত্তরে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই আত্মত্যাগের মানসিকতা নিয়ে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলাম। এর পরও আমি কখনো বিবেক ও নীতির প্রশ্নে আপস করি নি। এমন একটি পরিস্থিতির জন্য আমি বা আমার মতো সংখ্যাগরিষ্ঠ নীরব জনগণ দায়ী নয়। একজন নাগরিক হিসেবে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি খুবই হতাশ।

**প্রথম আলো** *গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় আপনি একজন উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?*

**মইনুল হোসেন চৌধুরী** বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার আর আগের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। এবারের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গঠন প্রক্রিয়াটা শুরু থেকেই বিতর্কিত। বিচারপতি কে এমন হাসান সাহেব চাপের মুখে দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করার পর সর্বশেষ বিকল্প বেছে নিয়ে রাষ্ট্রপতি নিজেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হন। বাকি বিকল্পগুলো বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে কি হয় নি তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে সর্বশেষ বিকল্পতে তো

রাষ্ট্রপতির তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হওয়ার বিধান রয়েছে। এখন বলা হচ্ছে রাষ্ট্রপতি দলীয় লোক। একটি দলের মনোনয়নে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট দলের লোক হবেন এটা তো স্বাভাবিক। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, রাষ্ট্রপতিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান করার এ বিধানটি সংবিধানে রাখা হয়েছিল কেন? ধরে নিলাম রাষ্ট্রপতি সংবিধান লঙ্ঘন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হয়েছেন, সে ক্ষেত্রে আমি তো বলব রাজনৈতিক দলগুলোও সংবিধান লঙ্ঘন করেছে। রাষ্ট্রপতি তাদের কাছে উপদেষ্টা কাদের করা যায় সে নাম চাইলেন আর দুই জোটের লোকজন গিয়ে নাম দিয়ে এলেন। রাজনৈতিক দলগুলো এটা করেছে, কারণ তারা উপদেষ্টা পরিষদে নিজেদের লোকজনকে ঢোকাতে চেয়েছে। ফলে তারাই তো নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় সরকার চায় বলে মনে হয় না। সংবিধান অনুযায়ী এবং এর চেতনা অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকার হবে নিরপেক্ষ ও নির্দলীয়। এখানে দলের কাছ থেকে নাম নেয়ার সুযোগ কই? বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সমস্যা হচ্ছে কেন তারা তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি। আমি তো মনে করি, চার দল ও ১৪ দল এখনও সরকার পরিচালনা করছে। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রোঅ্যাক্টিভ না হয়ে রিঅ্যাক্টিভ হিসেবে কাজ করছে।

**প্রথম আলো** *বর্তমান পরিস্থিতিকে আপনি কীভাবে দেখছেন?*

**মইনুল হোসেন চৌধুরী** বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মূল সমস্যা হচ্ছে তারা এখনও তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি। তত্ত্বাবধায়ক সরকার এখনও চার দল, ১৪ দল ও রাষ্ট্রপতি—এই ত্রিভুজের মধ্যে আটকা পড়ে গেছে। এক মাস সময় পার হয়ে গেছে, কিন্তু তারা এখনও এই চক্রের মধ্যেই পড়ে রয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থাটাই এমন যে ১১ জন মিলে যৌথভাবে দায়িত্ব পালন করবেন। এখানে এককভাবে সিদ্ধান্ত নেয়ার কিছু নেই। কিন্তু সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নেয়ার কাজটি হচ্ছে না। সমন্বয় ও বোঝাপড়ার অভাব রয়েছে।

**প্রথম আলো** *এবার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় বারদুয়েক সেনাবাহিনী মোতায়েনের প্রসঙ্গটি সামনে চলে এসেছিল। আপনি কি মনে করেন সেনা মোতায়েনের মতো কোনো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল?*

**মইনুল হোসেন চৌধুরী** এ বিষয়টি একটি গণতান্ত্রিক দেশে পুরোপুরি বেসামরিক প্রশাসনের ওপর নির্ভর করে। সেনাবাহিনী ডাকবে কি ডাকবে না, যখন ডাকবে এ সিদ্ধান্ত তারাই নেবে। এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট আইন রয়েছে। বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা দানের জন্য সেনা মোতায়েনের সিদ্ধান্ত হলে সেনাবাহিনীর কী করণীয়, কীভাবে আসবে, কী কাজ করবে তা খুবই পরিষ্কার। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের যে গাইডলাইন আছে তাতে এমনকি একজন জেলা প্রশাসক তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া ১০ দিন পর্যন্ত প্রয়োজনে সেনা মোতায়েন করতে পারেন। এর পরও দরকার পড়লে তিনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে তা বাড়াতে পারেন। এখন কথা হচ্ছে সেনাবাহিনীকে কখন

ডাকা হয়? যখন একটা দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ে, বেসামরিক প্রশাসন তা মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়। তা বন্যা-ভূমিকম্পের মতো দুর্যোগ হোক বা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি হোক। এটা বহু বছরের পুরনো বিধান। তবে সেনা মোতায়েন করার জন্য একটি নীতি মেনে চলা উচিত, এখন দেশে সেনা মোতায়েনের পরিস্থিতি হয়েছে কি না তা দেশ পরিচালনার দায়িত্বে যাঁরা রয়েছেন তাঁরাই ভালো অনুধাবন করতে পারবেন। তাঁদের বিবেচনা করে দেখতে হবে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এমন পর্যায়ে চলে গেছে কি না যে সেনাবাহিনীর সহায়তা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

**প্রথম আলো** *তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় সেনাবাহিনী রাষ্ট্রপতির অধীনে থাকে। আমরা দেখলাম এ পর্যন্ত দুবার সেনা মোতায়েনের আদেশ বা সে ধরনের পরিস্থিতির কথা শোনা গেছে। রাষ্ট্রপতির এ উদ্যোগকে অনেকে এক ধরনের হুমকি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আপনি কী মনে করেন?*

**মইনুল হোসেন চৌধুরী** আসলে রাষ্ট্রপতির এ উদ্যোগকে কেউ হুমকি হিসেবে দেখতে পারেন, কেউ প্রয়োজনীয় মনে করতে পারেন। আমরা তো সবকিছু রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখতে অভ্যস্ত। কিন্তু রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখার কারণেই অনেক কিছু আমাদের কাছে পরিষ্কার হয় না। রাজনৈতিক বিবেচনা থেকে যখন আপনি সেনাবাহিনীকে বা রাষ্ট্রপতিকে দেখবেন, তখন অনেক কিছুই অস্বচ্ছ এবং ঝাপসা থেকে যাবে—রাষ্ট্রপতি যখন এগোনোর উদ্যোগ নিয়েছেন তখন তিনি তা রাজনৈতিক বিবেচনা থেকে নিয়েছেন, না প্রশাসনিক বিবেচনা থেকে নিয়েছেন। এখন রাষ্ট্রপতি যদি রাজনৈতিক বিবেচনা থেকে কাজটি করে থাকেন সেটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। আসলে দেশে সবকিছুই রাজনৈতিকীকরণ হয়ে গেছে এবং সেনাবাহিনীকেও এর মধ্যে জড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে। সেনাবাহিনী ক্ষমতা নেবে কি নেবে না, এসব নিয়ে লেখালেখি হচ্ছে। এটা অনেকটা রাখালের 'বাঘ আসছে, বাঘ আসছে'—এ রকম হয়ে গেছে। বিষয়টি সেনাবাহিনীর ক্ষমতা নেওয়ার ব্যাপার নয়। তারা বেসামরিক প্রশাসনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করবে। এটা তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ব্যাপার নয়।

**প্রথম আলো** *সেনা মোতায়েনের প্রথম একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টারা বলেছেন, তাঁরা কিছুই জানতেন না। স্বরাষ্ট্রসচিব এ কাজটি কীভাবে করেছেন?*

**মইনুল হোসেন চৌধুরী** বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় কিছু বিষয় খুবই অস্বচ্ছ অবস্থায় রয়েছে। এটা আসলে সরকারের সিদ্ধান্তের বিষয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থায় প্রতিরক্ষা বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রপতির কাছে। বর্তমানে যদিও রাষ্ট্রপতি আর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান একই ব্যক্তি, কিন্তু এ রকম কিছু না হলেও এ ব্যবস্থাটির মধ্যে সমস্যা রয়েছে। আমি এর আগে বেশ কয়েকবার বলেছি যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থায় সশস্ত্র বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ

রাষ্ট্রপতির হাতে থাকার বিষয়টি যথাযথ নয়। প্রধানমন্ত্রীর সব ক্ষমতা তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধানের হাতে থাকবে আর প্রতিরক্ষা থাকবে রাষ্ট্রপতির হাতে এটা আমার বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য নয়। আগেই বলেছি যে প্রয়োজন পড়লে জেলা প্রশাসকও ১০ দিনের জন্য সশস্ত্র বাহিনী ডাকতে পারেন। কাছাকাছি যে ব্যাটালিয়ন আছে সেখানে চিঠি দিয়েই জেলা প্রশাসক সেনা সহায়তা চাইতে পারেন।

**প্রথম আলো** *নির্বাচনের সময় সেনা মোতায়েনের ক্ষেত্রে কী করা উচিত বলে মনে করেন? গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় ভোটকেন্দ্রে সেনা মোতয়েনকে অনেকে সমালোচনা করেছেন।*

**মইনুল হোসেন চৌধুরী** আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যদি সেনা মোতায়েন করা হয়, তবে তো সেখানে কোনো লাইন টেনে দেয়া সম্ভব নয়। তারা দূরে থাকবে, না ভোটকেন্দ্রের কাছাকাছি থাকবে—এভাবে নির্ধারণ করা কঠিন। বেসামরিক প্রশাসনকে সহযোগিতা বা 'ইন এইড টু সিভিল পাওয়ার'-এর ক্ষেত্রে তারা কী দায়িত্ব পালন করবে তা সুনির্দিষ্ট রয়েছে। আবার তখনকার ব্যাপারে আরও একটি অভিযোগ উঠেছিল যে সেনাবাহিনীকে ম্যাজিস্ট্রেসি দেয়া হয়েছে। এটা সম্পূর্ণ অসত্য। নির্বাচন কমিশন তাদের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব দিয়েছে। পুলিশ বা আনসারও তো আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে। এখন সেনাবাহিনীর লোকজন বুথের কাছে গেল বা কতটুকু কাছে গেল, এ ধরনের প্রশ্ন তোলা অর্থহীন। যদি তারা ভোটকেন্দ্রের ভেতর ঢুকে থাকে বা তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ থাকে, সেটা ভিন্ন কথা। ১৯৭০ ও '৭৩ সালের নির্বাচনের সময় ময়মনসিংহ ও ঢাকার অধিনায়ক হিসেবে আমি ভোটকেন্দ্রে গেছি, জিজ্ঞেস করেছি কোনো সমস্যা হচ্ছে কি না। তখন তো এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠে নি।

**প্রথম আলো** *কিন্তু অনেকে বলেছেন, ভোটকেন্দ্রের কাছে সেনা মোতায়েন থাকায় ভোটারদের মধ্যে ভীতি ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল।*

**মইনুল হোসেন চৌধুরী** সেনা মোতায়েনের বিষয়টি তো অন্যভাবেও দেখা যায়। আমি তো মনে করি এতে বরং ভোটারদের মধ্যে আস্থা ও নিরাপত্তার বোধ তৈরি হয়। ভোটাররা মনে করবেন যে তাঁরা নিশ্চিন্তে তাঁদের ভোট দিতে পারবেন। কেউ তাঁদের বাধা দিতে বা ভয় দেখাতে পারবে না। কারণ সামরিক বাহিনী ভোটকেন্দ্রের পাশে রয়েছে।

**প্রথম আলো** *অনেকের মত হচ্ছে যে নির্বাচনের সময় সেনাবাহিনী থাকবে, কিন্তু ভোটকেন্দ্র থেকে দূরে থাকবে। প্রয়োজন হলে তাদের ডাকা হবে।*

**মইনুল হোসেন চৌধুরী** এটা নির্ভর করে প্রশাসন কী চায় তার ওপর এবং বাস্তব পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করেই তাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। একটি জেলায় যদি প্রশাসন পরিস্থিতিকে ঝুঁকিপূর্ণ মনে করে এবং মনে করে যে পুলিশ দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যাবে না, তখন তারা যেভাবে প্রয়োজন সেনাবাহিনী মোতায়েনের

সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তিনটি বিশেষ লক্ষ্য সামনে রেখে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়। একটি হচ্ছে পূর্বসতর্কতামূলক, দ্বিতীয়টি, হচ্ছে নিবর্তনমূলক (প্রিভেন্টিভ) ও তৃতীয়টি হচ্ছে প্রসিকিউশন অর্থাৎ পরিস্থিতি সামাল দিতে সরাসরি বল প্রয়োগ। আমি মনে করি নিবর্তন বা প্রসিকিউশন ধরনের ব্যবস্থায় যাওয়ার আগেই যদি পূর্বসতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়া যায় সেটাই সবচেয়ে কার্যকর। কারণ নিবর্তনমূলক কিছু করার অর্থ হচ্ছে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া। কেননা সেনাবাহিনী পরিস্থিতি মোকাবিলা করবে গুলি ছুঁড়ে। এ জন্যই সেই ব্রিটিশ আমর থেকে শুরু করে সব সময়ই পূর্বসতর্কতামূলক ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়। এটাকে বলে 'ফ্লাগ মার্চ' বা 'শো অব ফোর্স'। এটা করলেই অনেক সময় পরিস্থিতি শান্ত হয়ে যায়, লোকজন আস্থা ফিরে পায়। নির্বাচনের ক্ষেত্রেও এ ধরনের পূর্বসতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হলে সাধারণ লোকজনের মধ্যে আস্থা ফিরে আসবে।

**প্রথম আলো** *গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় আপনি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছেন। বর্তমান আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে কীভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব বলে মনে করেন?*

**মইনুল হোসেন চৌধুরী :** তত্ত্বগতভাবে আমরা সবাই জানি কীভাবে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষা করতে হবে। কিন্তু আমাদের মূল সমস্যা হলো আমরা মাইক্রো ব্যবস্থাপনাটা বুঝি না বা করতে পারি না। আমরা সবকিছু ম্যাক্রো পর্যায়ে দেখি। কারণ এর সবকিছুই বইপত্রে পাওয়া যায়। ফলে আমি মনে করি, প্রশাসন যদি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে মাইক্রো ব্যবস্থাপনার কাজটি ভয়ভীতি ও পক্ষপাতিত্বের ঊর্ধ্বে উঠে না করতে পারে, তবে কাজটি খুই কঠিন হবে।

**প্রথম আলো** *নির্বাচনের জন্য নিরপেক্ষ প্রশাসন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের করণীয় কী? আপনারা কী বলেছিলেন?*

**মইনুল হোসেন চৌধুরী** প্রশাসনকে নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন পরিচালনার কাজে লাগাতে হলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে নিজেদের বিবেক ও বিবেচনা দিয়ে কাজ করতে হবে। সে অনুযায়ী বদলি করতে হবে। আমরা যখন এ কাজটি করেছি, তখন কোনো প্রেসক্রিপশন নিয়ে কাজ করি নি। কোনো রাজনৈতিক দলের প্রস্তাব মানা বা কাউকে খুশি করার জন্য কাজ করি নি। কারও বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ উঠলে ভিন্ন কথা। সে ক্ষেত্রে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারকেও সেভাবে কাজ করতে হবে। আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কাজ করলে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

**প্রথম আলো** *বর্তমান রাজনৈতিক সংকট নিরসনে বিদেশি উন্নয়ন সহযোগী ও দাতা দেশগুলোর ভূমিকাকে কীভাবে দেখছেন?*

**মইনুল হোসেন চৌধুরী** আমি মনে করি বিদেশিদের পৃষ্ঠপোষকতায় গণতন্ত্র বাঁচানো যায় না। এটা কখনও কোনো দেশে হয় নি। ইরাকে হচ্ছে না, আফগানিস্তানে হচ্ছে না, সোমালিয়ায় হয় নি। বিদেশিরা আমাদের গণতন্ত্রের জন্য কিছু করবে—এ আশা করলে হবে না।

**প্রথম আলো :** *কিন্তু রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে চলে গেছে যে—*

**মইনুল হোসেন চৌধুরী** এটা খুবই দুঃখজনক। রাজনৈতিক সংকট পুরো দেশকে অচলাবস্থার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। আমরা গণতন্ত্রের কথা বলি, কিন্তু গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবহারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নই। যেমন, দাবি আদায়ের জন্য নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন হতে পারে; কিন্তু বন্দর, অবরোধ করে রাখাটা কি সংগত? নিজের দেশের নাগরিকেরা কীভাবে তাদের বন্দর অবরোধ করে রাখতে পারে? কোনো শত্রু-রাষ্ট্র আমাদের সমুদ্র বা বিমানবন্দর বন্ধ করতে পারে, আমরা তা পারি না। এটা প্রতিবাদের কোনো ভাষা হতে পারে না। সুপ্রিম কোর্টে কী হলো? প্রধান বিচারপতির সিদ্ধান্ত নিয়ে বিরোধিতা থাকতে পারে; কিন্তু এ নিয়ে যা ঘটল তা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কোনো অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে আপনি যদি নিজেই অন্যায় করেন, তবে আমরা সভ্য হলাম কোথায়? চোখের বদলে আমরা যদি চোখ নিতে শুরু করি, তবে তো পুরো জাতি অন্ধ হয়ে যাবে।

**প্রথম আলো** *আপনাকে ধন্যবাদ।*

**মইনুল হোসেন চৌধুরী** ধন্যবাদ।

*প্রথম আলো* ১০ ডিসেম্বর ২০০৬

সাক্ষাৎকার

## সামরিক অভ্যুত্থানের আশঙ্কা নেই বললেই চলে

**প্রথম আলো** *আপনি দীর্ঘদিন সেনাবাহিনীতে ছিলেন এবং স্বাধীনতার পরপর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় জড়িত ছিলেন, অন্যদিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন। দেশের বর্তমান অবস্থা নিয়ে আপনার প্রতিক্রিয়া কী?*

**মইনুল হোসেন চৌধুরী** দেশে ক্রমাগত বোমা-হামলা নিয়ে জনগণ উদ্বিগ্ন, মর্মাহত। স্বাভাবিকভাবে আমিও উদ্বিগ্ন। কিন্তু এটা তো একদিনে হয় নি। এটা দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত অর্থনৈতিক বৈষম্য, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় এবং আইন-শৃঙ্খলার সঠিক প্রয়োগের ব্যর্থতার বহিঃপ্রকাশ। ধাপে ধাপে জঙ্গিতৎপরতা বেড়ে এই অবস্থায় এসেছে। এরকম জঙ্গি কর্মকাণ্ড কখনই হঠাৎ করে ঘটে না। এর জন্য একটি কাঠামো, সংগঠন, লোকবল এবং সর্বোপরি অস্ত্র ও গোলাবারুদ প্রয়োজন। প্রশাসনের উচিত ছিল প্রথম থেকেই এগুলোর দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখা এবং এ-ধরনের কর্মকাণ্ড অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা। যশোর থেকে গাজীপুর হয়ে নেত্রকোনা পর্যন্ত ঘটনা বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখব, বর্তমান সরকার এবং বিগত সরকার উভয়েই এ-বিষয়টিকে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দিয়ে সঠিক পদক্ষেপটি নেয় নি।

**প্রথম আলো** *এ-পরিস্থিতিতে দেশের ব্যবসায়ী মহল ভাবছে এটা দেশের জন্য একটা বিরাট সমস্যা। সম্প্রতি ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ জঙ্গিতৎপরতা দমনে সেনাবাহিনী নামানোর কথা বলেছেন। এ-বিষয়ে আপনার মতামত কী?*

**মইনুল হোসেন চৌধুরী** আমার মনে হয় না, এই পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনী কোনো 'ম্যাজিক' দেখাতে পারবে। সেনাবাহিনী তো দেশের সার্বিক প্রশাসনেরই অংশ। সেনাবাহিনীর প্রধান কাজ হলো বহিঃশত্রুর হাত থেকে দেশ ও জনগণকে রক্ষা করা, যদিও সরকার জনস্বার্থে অন্যান্য কাজে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করতে পারে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময় ব্যবহার করা হচ্ছেও।

**প্রথম আলো** *কিন্তু জনমনে যে-পরিমাণ আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে সেটিই বড় ভাবনার বিষয়। দেশের বিদ্যমান কাঠামোয় বোমা-হামলা ঠেকানো যাচ্ছে না বলেই এমনটি ভাবা হচ্ছে।*

**মইনুল হোসেন চৌধুরী** সেনাবাহিনীকে আমাদের দেশেও অনেক সময় বেসামরিক কাজে নিয়োগ করা হয়েছে। তাই অনেকে হয়তো ভাবছে এখন এই পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনীর প্রয়োজন। আবার অনেক রাজনীতিবিদ ভাবছেন, বোমা-হামলা ঠেকাতে সেনাবাহিনী ব্যবহার করা ঠিক হবে না, সাংবিধানিকভাবে যদিও সেনাবাহিনী প্রশাসনের একটি অঙ্গ। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো, কেবল তাদের দিয়েই কি এই সমস্যার সমাধান সম্ভব? আমি নিজে তা মনে করি না।

**প্রথম আলো** *কিন্তু জঙ্গিতৎপরতা তো সেভাবে মোকাবিলা করা যাচ্ছে না।*

**মইনুল হোসেন চৌধুরী** বোমাহামলা বন্ধ করা যাচ্ছে না অদক্ষতা, প্রশাসনিক গাফিলতি এবং সবকিছু রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার কারণে। বিশেষ করে আইন-শৃঙ্খলাকে রাজনীতির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়ার কারণে।

**প্রথম আলো** *সেটা ঠিক। কিন্তু জঙ্গিরা যেহেতু বিস্ফোরক ব্যবহার করছে, আর্মিরা গোলাবারুদ ও বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ, সেজন্যই কথা উঠছে যে, এক্ষেত্রে আর্মি কোনো ভূমিকা রাখতে পারে কি না?*

**মইনুল হোসেন চৌধুরী** আর্মি তো অনেক ক্ষেত্রেই বিশেষজ্ঞ। ট্রাফিক কন্ট্রোল করতেও তো আর্মি নামানো হয়েছিল। যানজটের সমস্যার কি তাতে সমাধান হয়েছে?

**প্রথম আলো :** *সেই অর্থে হয় নি।*

**মইনুল হোসেন চৌধুরী** আমি বলব বেশিরভাগ সময়ই এসব ছিল লোক-দেখানো উদ্যোগ। কিন্তু কাজের কাজ কিছু না হওয়ায় উল্টো সেনাসদস্যদের মনোবলে বিরূপ প্রভাব পড়েছে।

**প্রথম আলো** *তারপরও তো জঙ্গিতৎপরতা দমনের গুরুত্ব খাটো করে দেখা যায় না।*

**মইনুল হোসেন চৌধুরী** আমি সেই একই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলব, অন্য যেসব বিষয় আছে যেমন,উচ্ছৃঙ্খলতা, দুর্নীতি, লুটপাট এ সবকিছুর দিকেই নজর দিতে হবে। একটা থেকে আরেকটার জন্ম হয়। এটা দুঃখজনক যে, জঙ্গি বোমায় লোক মারা যাচ্ছে, শত শত পঙ্গু হচ্ছে। এটা যেমন সত্য ঠিক সেভাবে দুর্নীতি, লুটপাট ও অবৈধ ব্যবসার ফলে কোটি কোটি লোক এবং খোদ দেশ অর্থনৈতিকভাবেও পঙ্গু হয়ে পড়ছে। সবকিছুই সার্বিক পরিস্থিতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। জঙ্গি ও বোমা হামলার বিষয়টি সার্বিকভাবে দেখতে হবে। কোনো একটি সমস্যাকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে তার সমাধান করা দুরূহ।

**প্রথম আলো** *এখন জরুরিভিত্তিতে কী করা উচিত? পুলিশ প্রশাসনের ব্যর্থতার কারণে কি আর্মির কথা আসছে?*

**মইনুল হোসেন চৌধুরী** সেভাবে বলাও ঠিক হবে না। পার্শ্ববর্তী দেশেও সেনাবাহিনীর ১ লাখ ২০ হাজারের মতো (৪০ ব্রিগেড) সদস্য বেসামরিক

বাহিনীকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে সাহায্য করছে। ওখানে এসব নিয়ে এত হইচই-চেঁচামেচি হয় না। কারণ তারা এর সঙ্গে রাজনীতিকে মিশিয়ে ফেলে না। স্বাভাবিক প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় কাজ করে। সরকার যদি সৎভাবে মনে করে যে, সামরিক বাহিনী নিয়োগের প্রয়োজন আছে তা হলে নৈতিক কিংবা আইনগত কোনো বাধা দেখি না। তবে আগেই বলেছি, হঠাৎ করে আর্মি কি দীর্ঘদিন ধরে গড়ে-ওঠা এই সমস্যার কাঙ্ক্ষিত সমাধান দিতে পারবে? তার ওপর আমাদের সামরিক বাহিনীর একটা বিরাট অংশ বিদেশে কর্মরত। বিশেষ করে অফিসারস্বল্পতার কারণে ইন্টারনাল সিকিউরিটি ডিউটিতে নানা কারণে সমস্যা হয়। বিশেষ করে তদারকিতে।

**প্রথম আলো** *পরিস্থিতি মোকাবিলায় এখন কী করা দরকার?*

**মইনুল হোসেন চৌধুরী** সর্বপ্রথম গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে আরও তৎপর করতে হবে এবং আমাদের যে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী রয়েছে তথা আনসার, পুলিশ, র‍্যাব, বিডিআর দিয়ে এ-সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। তবে তাদের সুসংগঠিত করে স্বল্প, মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করে জঙ্গি সন্ত্রাসীদের দমন করতে হবে। এর জন্য সঠিক রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নেতৃত্ব প্রয়োজন।

**প্রথম আলো** *সাম্প্রতিক কয়েকটি বোমা-হামলার ঘটনায় প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, হামলাকারীরা আত্মঘাতী বোমাবাজ। কেউ যদি নিজের জীবন দিয়ে হামলা করতে চায়, তা হলে তাকে কীভাবে আটকাবেন?*

**মইনুল হোসেন চৌধুরী** আটকানো যাবে না কেন? বাংলাদেশের সাম্প্রতিক আত্মঘাতী বোমা-হামলা নতুন কোনো ফেনোমেনা (ঘটনা) নয়, এটা অনেক দেশেই ঘটছে এবং ভবিষ্যতেও ঘটবে। তারাও তো প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করছে, অনেক ক্ষেত্রে সফলও হচ্ছে। এখানে কিছু বিষয় আমাদের বুঝতে হবে। কারা আত্মহত্যার মাধ্যমে বোমা-হামলা করছে বা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। তারা কারা? কেন করছে, তার কারণ খুঁজে বের করতে হবে। আমাদের তো গোড়ায় গলদ আছে। এর স্পন্সর কে? সুইসাইড যে করছে আমার মনে হয় না সে নিজের ইচ্ছায় সজ্ঞানে করছে। তাদের ধর্ম ও অর্থের মাধ্যমে বিপথগামী করা হচ্ছে। সরকারের উচিত স্পন্সর এবং এদের নেতাদের খুঁজে বের করা। যদি হিসাব করি, একটা বোমা তৈরি করতে অন্তত হাজার টাকার ওপরে লাগে। এই টাকার উৎস কী?

**প্রথম আলো** *তার মানে আপনি বলছেন, সোর্স অব ফাইন্যান্স খুঁজে বের করা দরকার?*

**মইনুল হোসেন চৌধুরী** ঠিক। যারা আত্মঘাতী বোমা-হামলা করছে, তাদের ধর্মের নামে বিপথগামী করা হচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রে তারা তা করছে অভাবের তাড়নায়। এসব ঘটনায় যারা জড়িয়ে পড়ছে তারা বেশিরভাগই বেকার ছেলে, অভাবী পরিবার থেকে আসছে। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এরা লেখাপড়া করলেও

বেশিরভাগই মাদ্রাসার সঙ্গে জড়িত। কিছু লোক বিনা পয়সায় তাদের খাওয়া-দাওয়াসহ তথাকথিত শিক্ষার ব্যবস্থা করছে। এ-অবস্থায় ওদের বিপথগামী করাটা অত্যন্ত সহজ।

**প্রথম আলো** *গাজীপুর বোমা-হামলার পর বলা যায় সেখানে সর্বাত্মক সতর্কতা রেড এ্যালার্ট জারি করা হয়েছিল। কিন্তু তার দুদিন পর আবার সেখানে বোমা-হামলা হলো। এতে কি সেখানে গোয়েন্দা-তৎপরতার দুর্বলতা প্রমাণ হয় না?*

**মইনুল হোসেন চৌধুরী** শুধু গোয়েন্দা নয়, সবক্ষেত্রেই দুর্বলতা আছে। বিশেষ করে এ পরিস্থিতিতে যে-ধরনের সতর্কতার প্রয়োজন তার অভাব ছিল।

**প্রথম আলো** *অনেকে বলেন, আমাদের গোয়েন্দাদের অদক্ষতার কারণেই এসব ঘটছে।*

**মইনুল হোসেন চৌধুরী** আমি বলব, তাদের প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে। এই প্রশিক্ষণটা হওয়া দরকার ওপরের লেভেল থাকে। শুধু মাঠকর্মীকে ট্রেনিং দিয়ে কোনো লাভ হবে না। প্রশাসনিক কমকর্তাদেরও ট্রেনিং দিতে হবে। জানতে হবে কীভাবে বিষয়টি হ্যান্ডেল করতে হয়। শুধু হুইসেল ও সাইরেন বাজিয়ে ও নিনজা পোশাক দিয়ে ভয়ভীতি দেখিয়ে কিছু হবে না। আইন-শৃঙ্খলার মাইক্রো ম্যানেজমেন্ট (খুঁটিনাটি বিষয়) জানতে হবে।

**প্রথম আলো** *এই বিষয়টি কি ব্যাখ্যা করবেন?*

**মইনুল হোসেন চৌধুরী** আমাদের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সর্ব পর্যায়ে দক্ষতার অভাব। কোথায় শৃঙ্খলা আছে? বাংলাদেশে তো আইনের অভাব নেই। কিন্তু দুর্নীতি হচ্ছে, সন্ত্রাস হচ্ছে, আইনের প্রয়োগ কি হচ্ছে? ঘর থেকে বের হয়ে রাস্তায় পা রাখলে বুঝবেন সবকিছুতে অরাজকতা। কোথাও কোনো শৃঙ্খলা নেই। আইনের সঠিক প্রয়োগ করতে হলে সদিচ্ছা ও দক্ষতা থাকতে হবে। আমাদের দেশে আইনের প্রয়োগ হয় না, হয় অদক্ষতার নাহয় দুর্নীতির কারণে। ফলে দেখা যাবে সবসময় তারা ঘটনার পেছনে পড়ে থাকে। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে রি-অ্যাকটিভ নয়, প্রো-অ্যাকটিভ হতে হবে।

**প্রথম আলো** *প্রো-অ্যাকটিভ বলতে আপনি আসলে কী বোঝাতে চাইছেন?*

**মইনুল হোসেন চৌধুরী** সতর্ক হওয়া এবং ঘটনা ঘটার আগে কার্যকর পদক্ষেপ নিয়ে তা থামিয়ে দেয়া। আমাদের তদারকি দুর্বল। সব অধিনায়কই অফিসে বসে ম্যানেজারি করতে পছন্দ করেন। কিন্তু প্রয়োজন 'সাইট বস' তথা মাঠপর্যায়ে তদারকি। 'প্র্যাকটিস অব প্রিন্সিপাল'-এর চেয়ে 'প্র্যাকটিস অব অ্যাকশন' জরুরি। ২০০৩ সালে অক্টোবরে আপনাদের পত্রিকায় 'অমাবস্যার রাতে কালো বেড়ালের খোঁজে' শিরোনামে আমি লিখেছিলাম আমাদের গোয়েন্দাদের অবস্থা যদি এ রকম হয় তা হলে আরও অনেক দুর্ঘটনা ঘটবে দেশে। 'দেশটা কেমন করে এমন হলো' শিরোনামে আরেকটি লেখায় আমি বলেছিলাম, 'চিয়ার আপ, দা ওয়াস্ট ইজ ইয়েট টু কাম।'

**প্রথম আলো :** *আপনি কি এ-ধরনের ঘটনার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন?*

**মইনুল হোসেন চৌধুরী** আমি বলি নি যে, জঙ্গিরা বোমাবাজি করবে কিংবা আত্মঘাতী হামলা হবে। তবে বলেছিলাম দেশের প্রশাসনিক ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর দুর্বলতার কারণে দেশ বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

**প্রথম আলো** *এটা কি শুধু গোয়েন্দাদেরই ব্যর্থতা নাকি রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যর্থতা আছে?*

**মইনুল হোসেন চৌধুরী :** রাজনীতিবিদরাই তো দেশ চালান।

**প্রথম আলো :** *আমরা অন্য প্রসঙ্গে আসি। বোমা-হামলার সঙ্গে কি ধর্মীয় আদর্শ জড়িয়ে আছে, নাকি পুরোপুরিই সন্ত্রাসী ঘটনা?*

**মইনুল হোসেন চৌধুরী** ধর্মীয় আদর্শ থাকতে পারে। কিন্তু আমি মনে করি, এটা অনেকটা ককটেলের মতো। কিছু ধর্ম কিছু টাকা! দুটি মিলে জিনিসটা ঘোলাটে হয়েছে। কোনো ধর্মে কী আছে যে, আপনি নিরীহ লোককে মারবেন? এগুলো করছে ধর্মের নামে বিপথগামী কিছু লোক। এদের দমন করা কঠিন কিছু নয়।

**প্রথম আলো** *আরেকটা কথা জানতে চাই, দেশে এখন যে-জঙ্গিতৎপরতা আমরা প্রত্যক্ষ করছি, তার সঙ্গে কি আন্তর্জাতিক জঙ্গিতৎপরতার যোগসূত্র আছে, নাকি এটি হোমগ্রোন অর্থাৎ দেশেই উদ্ভব?*

**মইনুল হোসেন চৌধুরী** দুটোই হতে পারে। খতিয়ে দেখতে হবে এতে কারা লাভবান হচ্ছে। আমার কাছে তো নির্দিষ্ট কোনো প্রমাণ নেই।

**প্রথম আলো** *বিন লাদেনকে হয়তো আমেরিকাই জন্ম দিয়েছিল। আমাদের দেশে কি তেমন কারও হাত থাকতে পারে?*

**মইনুল হোসেন চৌধুরী** আফগানিস্তানে বিন লাদেনকে আমেরিকা তৈরি করেছিল রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য। কিন্তু আমরা কার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হব? নিজেরা নিজেদের বিরুদ্ধে? যদি তা-ই হয়, তা হলে বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমাদের মতো অথর্ব ও অধম জাতি আর নেই। তা হলে তো আমরা অনেক কষ্টে অর্জিত দেশকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে যাচ্ছি!

**প্রথম আলো** *বাংলা ভাই বা শায়খ আবদুর রহমানকে ধরার জন্য ১ কোটি টাকা ঘোষণা করা হলো। এই পদ্ধতিটার যৌক্তিকতা কী?*

**মইনুল হোসেন চৌধুরী** আমরা অনেক কিছুই অনুকরণ করি। এটাও তা-ই। র‍্যাব বলে, কোবরা বা চিতাবাহিনী বলেন, এগুলো অন্য দেশের অনুকরণে তৈরি। আসলে যখন কোনোকিছুতে ব্যর্থতা জেঁকে বসে তখন আমাদের দেশে সেটাকে ঢাকার জন্য চমক সৃষ্টি করা হয়। সেটা হোক রাজনীতি, হোক তা প্রশাসনে!

শুধু পুরস্কার ঘোষণা করে বসে থাকলে কিছু হবে না। আমাদের গোয়েন্দা ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর দক্ষতা বাড়াতে হবে। আমাদের বিদ্যমান লোকবল নিয়েই

চলতে হবে। এগুলোকে ঢেলে সাজাতে হবে। শুধু ইউনিফর্ম, অস্ত্রশস্ত্র আর গাড়িঘোড়া দেয়াই যথেষ্ট নয়। আইন-শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে বর্তমান অবস্থার জন্য দায়ী ৫০ ভাগ অদক্ষতা, ৫০ ভাগ রাজনীতি ও দুর্নীতি।

**প্রথম আলো** *আপনাকে যদি দায়িত্ব দেয়া হয়, তা হলে আপনি কী কী পদক্ষেপ নেবেন?*

**মইনুল হোসেন চৌধুরী** প্রথম পদক্ষেপ—সব ধরনের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' (ন্যূনতম সহ্য করা হবে না)। শাস্তি হবে নির্মম এবং ব্যতিক্রমহীন। তারপর ন্যায়নিষ্ঠা ও সচেতনতার বোধ জাগাতে হবে। রাজনৈতিক দল নয়, জনগণকে সম্পৃক্ত করতে হবে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীকে দক্ষ করে তুলতে হবে। শুধু যন্ত্রপাতি বাড়ালেই হবে না। সবকিছুর পেছনেই মানুষ। যন্ত্রপাতি তো মানুষই চালাবে। তাই মানুষকে দক্ষ করতে হবে। কথায় আছে 'ম্যান বিহাইন্ড দ্য গান, নট দ্য গান। (বন্দুক যে চালায় সে-ই আসল, বন্দুকটা নয়)

**প্রথম আলো :** *চলমান পরিস্থিতি যদি অব্যাহত থাকে তা হলে এমন কি হতে পারে পুরো রাজনৈতিক ব্যবস্থা বদলে যাবে?*

**মইনুল হোসেন চৌধুরী** আমি মনে করি, তেমন কিছুই ঘটার সম্ভাবনা নেই। যারা গুজব ছড়াচ্ছে যে, আর্মি ক্ষমতা দখল করবে, আমি মনে করি এটা তারা করছে রাজনৈতিকভাবে একপক্ষ তার প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য। আমার মতে, এদেশে আর সামরিক অভ্যুত্থানের আশঙ্কা নেই বললেই চলে। বর্তমান বাস্তবতায় আমার তো মনে হয় না, আর্মি অগণতান্ত্রিক কোনো কাজে সম্পৃক্ত হবে।

**প্রথম আলো :** *এটা কি নব্বইয়ের অভিজ্ঞতা থেকে বলছেন?*

**মইনুল হোসেন চৌধুরী** এখন দেশের অবস্থা অন্যরকম। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে তিনটা নির্বাচন হয়েছে। বন্দুকের মুখে ক্ষমতা নেয়ার সময় চলে গেছে। মানুষ অধিকার-সচেতন, তারা চায় গণতন্ত্র এবং সরকার পরিচালনায় তাদের অংশগ্রহণ, যদিও আমাদের গণতন্ত্রে তা অনুপস্থিত। শুধু ভোটের ক্ষেত্রেই গণতন্ত্র! পুরো ব্যাপারটাকে দেখতে হবে ঠাণ্ডা মাথায়, সবার ওপর দেশের স্বার্থ। কোনোভাবেই দলীয় দৃষ্টিকোণ ও ক্ষমতার হাতিয়ার হিসেবে এসব ঘটনাকে দেখা ঠিক হবে না।

**প্রথম আলো** *এত হতাশার পরও আশার কথা কিছু বলতে চান কি?*

**মইনুল হোসেন চৌধুরী** রাজনীতিবিদরা সত্যিকার অর্থে যদি দেশের ভালো চান তা হলে তাদেরও বোমা-হামলাকে গুরুত্বসহকারে নিতে হবে। এ নিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা লোটা থেকে সবাই বিরত থাকবেন এবং দেশকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবেন না।

*প্রথম আলো* ১১ ডিসেম্বর ২০০৫ ইং

# অমাবস্যার রাতে কালো বিড়ালের খোঁজে

এ-পর্যন্ত যৎসামান্য লেখালেখি করলেও আমার নিজস্ব কিছু পাঠক যে তৈরি হয়েছে এ-ব্যাপারে এখন আমি নিঃসন্দেহ! কারণ, কিছুদিন আগে বিভিন্ন দূতাবাস ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সামনের ফুটপাতসহ গুলশানের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ফুটপাত দখল এবং পার্কিং-নিষিদ্ধ রাস্তার ওপর গাড়ি পার্ক করা নিয়ে লিখেছি। ফলাফল—সেসব পয়েন্টে দখল ও পার্কিং আরও বেড়েছে। আগে যেখানে দু-তিনটা গাড়ি পার্ক করা হতো, এখন পথচারীদের হাঁটাচলার পথ আটকে নতুন করে তৈরি সুসজ্জিত ফুটপাতের ওপর আরও বেশি গাড়ি তুলে রাখা হয়। সার্থক লেখালেখি! এরপর বাংলাদেশে বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের বিশেষ করে একটি বড় ও ধনীদেশের রাষ্ট্রদূতের অযাচিত আচরণ ও ঔদ্ধত্য নিয়ে পত্রিকান্তরে লিখেছি। দেশটির নতুন এক রাষ্ট্রদূত এখানে এসেছেন 'উইথ লট অব প্লেফুল এনার্জি'। প্রথম দিন থেকেই তাঁকে নিয়ে লোফালুফি এবং তাঁর সান্নিধ্যলাভের জন্য সার্টিফায়েড বুদ্ধিজীবী ও কিছু সাংবাদিকের ব্যাকুলতা তাঁকে অকূটনৈতিক আচরণ প্রকাশে উৎসাহিত করছে। তাই আর কোনো বিষয়ে লিখতে সংকোচ বোধ করছি। এর কারণ হয়তো আমার লেখার 'উল্টো ফল'। তেমনি বর্তমান অবস্থায় পরিচিতজনের অনুরোধে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে লেখার ইচ্ছা জন্মালেও এই ভেবে শঙ্কিত যে, পরিস্থিতির আরও অবনতি না হয়ে যায়।

২

'ইসলাম জিন্দা হোতা হ্যায়, হর কারবালাকে বাদ'—পাকিস্তানের জাতীয় কবি আল্লামা ইকবালের কথা। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এর প্যারোডি হতে পারে এমন—'গোটা কয়েক লাশের পরে/সরকার মহোদয়ের টনক নড়ে।'

কোন পরিস্থিতিতে 'অপারেশন ক্লিনহার্টের' পর যৌথ অভিযান 'স্পাইডার ওয়েভ' শুরু হয়েছে, তা নিয়ে বাড়তি কিছু বলতে চাই না। ভাবছি, এরপর কী হবে? আবার কোন চমকপ্রদ ও রোমাঞ্চকর নাম নিয়ে কোন অভিযান শুরু হবে!

অপারেশন ক্লিনহার্ট নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে। কোনো জিনিস পরিষ্কার (ক্লিন) করতে গেলে যা দিয়ে পরিষ্কার করা হয় তা ময়লা হয়ে যায়। আবার অনেক সময় কোনো জিনিস পরিষ্কার না হয়েও পরিষ্কারকারী বস্তু ময়লা হয়। ক্লিনহার্ট বিতর্কের মূলে ছিল এসব ময়লা, পার্শ্বময়লার আধিক্য। শেষে প্রশ্ন ছিল— ক্লিনহার্ট সফল, নাকি ব্যর্থ? বিতর্কের জাল বড় হয়েছিল। তবে নতুন জাল বসাতে বা ফেলতে হয়েছে আইন-শৃঙ্খলা উদ্ধার করতে। এর নামও বেশ চমৎকার। মাকড়সা জাল বা 'স্পাইডার ওয়েভ'। হয়তো স্পাইডার ওয়েভের প্রয়োজনীয়তার উদ্ভব ক্লিনহার্টের পরিপূর্ণ সফলতার অভাব থেকেই। আগের আলোচনা-সমালোচনার ফল না হওয়ায় স্পাইডার ওয়েভের সার্থকতা-ব্যর্থতা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না।

যতদূর জানি, মাকড়সা জাল বোনে প্রথমত নিজেকে রক্ষা করার জন্য। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে একের পর এক আইনরক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য খুন হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পরিচালিত এই অভিযানের নাম 'স্পাইডার ওয়েভ' হয়তো যুক্তিযুক্তই হয়েছে। হালে দেখা যাচ্ছে, তাঁরা নিজেদের মোটামুটি রক্ষা করতে পেরেছেন। কিন্তু যাদের রক্ষা করার জন্য এই বাহিনীগুলোর জন্ম, সেই জনগণ তো রক্ষা পাচ্ছে না। সারাদেশে প্রতিদিন গড়ে ১০ জন করে খুন হচ্ছে। খোদ রাজধানীতে অবস্থা ভালো বললে অতিরঞ্জিত হবে। মাকড়সা আবার প্রয়োজন বুঝে নিজের তৈরি জাল নিজেই খেয়ে ফেলে। 'স্পাইডার ওয়েভ' গুটিয়ে আনা হয়তো সেটাই ইঙ্গিত করে। কিন্তু মাকড়সা জাল পেতে নিজেকে রক্ষার পাশাপাশি কিছু পোকামাকড়ও ধরে। এই স্পাইডার ওয়েভ সেরকম কিছু ধরতে ব্যর্থ হয়েছে। কথা হলো, আমরা কি ভয় থেকে মুক্তির জন্য 'অভিযান চক্রে' পড়ে যাচ্ছি! ইংরেজিতে একটি কথা আছে—

Ever tried, ever failed
Never mind.
Try again fail again
Fail better.

(চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছ, ক্ষতি কী; আবার চেষ্টা কর, আবার ব্যর্থ হও, ব্যর্থ হও ভালোভাবে।)

কিন্তু আমরা এই গরিব দেশে সরকারি অর্থের অপচয়ের দিকটি নিয়ে আদৌ ভাবছি কি?

৩

আমি ব্যক্তিগতভাবে ১৯৬৪ সাল থেকে অনেকবার 'আইন-শৃঙ্খলা' বিষয়ে সরাসরি বিভিন্ন পর্যায়ে যুক্ত ছিলাম। সব মিলে আমার যা অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে বলতে পারি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার বিশেষ অভিযানে প্রচুর সরকারি টাকা খরচ হয়। আর

পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিকল্পনা, সংশ্লিষ্টদের যোগ্যতা ও সার্বিক কমিটমেন্ট, বিশেষ করে সততার ঘাটতি থাকলে খরচ কয়েক গুণ বেড়ে যায়। তার ওপর আমাদের যে দুর্নীতিক্লান্ত প্রশাসন, তাতে তো আর কথাই নেই। বলা বাহুল্য, এ সবই গরিব জনগণের পয়সা। কিন্তু আমাদের দেশে সরকারি লোকজন যেভাবে এ-অর্থ অপচয় করে তাতে মনে হয় না যে, এগুলোর মালিক জনগণ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি আফগানিস্তান ও ইরাকে দুটি বড় ধরনের অভিযান পরিচালনা করেছে। বিদেশে এসব অভিযান চললেও আমেরিকানদের দৃষ্টিতে এটা করা হয় জাতীয় নিরাপত্তার জন্য। এ-অভিযান শুরুর আগে থেকেই একটা উল্লেখযোগ্য আলোচনা ছিল—অভিযানের খরচ। এখনও এই অর্থের বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে এবং বলা বাহুল্য, কংগ্রেস থেকে অভিযানখাতে টাকা খরচের ব্যাপারটা অনুমোদন করাতে হয় এবং এই অনুমোদন পেতে সেখানকার সরকারকে অনেক বেগ পেতে হয়। সে নিয়ে কংগ্রেসের বিতর্ক সংবাদমাধ্যমের জন্য উপজীব্য, উপভোগ্য ও (জনগণের জন্য) উপকারী খোরাক হয়। বিশ্বের সব দেশেই বিশেষ কোনো অভিযানের জন্য আলাদা অর্থ বরাদ্দ হয় এবং জনগণকে তা জানানো হয়। কিন্তু আমাদের দেশে এ-ধরনের সংস্কৃতি গড়ে ওঠে নি। বিশেষ অভিযান এবং নতুন নতুন বাহিনী ও স্কোয়াড গঠন, তাদের নানা মহড়া ও যৌথ অভিযান একের পর এক চলছে। এর আগে-পরে টাকা খরচের বিষয়টি কেউ জানতে পেরেছে কি না সন্দেহ। কেন এমন হচ্ছে? উত্তর—যে-কোনো সরকারি অর্থ খরচ যুক্তিসঙ্গত হবে বা হয়েছে কি না তার বিচার হয় ফলাফলের ভিত্তিতে। ফলাফল যদি সন্তোষজনক না হয় তবে ধরে নিতে হবে খরচটা অযথা এবং তার দায়দায়িত্ব নিতে হয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে। আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে এটা হচ্ছে 'বিড়াল ধরতে গিয়ে গরু হারানো'র মতো অবস্থা।

সম্প্রতি জাতিসংঘের দুটি সংস্থায় উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করার সুবাদে জেনেছি, বাংলাদেশের ৭৭ শতাংশ লোক দিনে ১২৫ টাকার নিচে আয় করে থাকে। দুর্নীতিতে আমরা পরপর তিনবার 'ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট' হয়েছি। দারিদ্র্যসূচক অনুযায়ী ৮৮টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৭৭ নম্বরে। কিন্তু আমাদের সরকারি অর্থের ব্যবহার দেখলে এটা বোঝা মুশকিল। আমাদের এখানে প্রবাদ হয়ে গেছে, 'টাকা কোনো সমস্যা না'। আর সরকারি অর্থ হলে তো কথাই নেই! অন্যান্য বিষয়ের মতো গত দুটি বিশেষ অভিযানের দিকে তাকালে তা-ই মনে হয়। ক্ষমতায় যাঁরা থাকেন তাঁদের হাবভাব দেখলে মনে হয় দেশের টাকা তাঁদের নিজের।

টাকার প্রসঙ্গটা তোলা হয়েছে এ-কারণে যে, এটার জন্য জবাবদিহি থাকলে এসব অভিযানের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি হতো নিখুঁত ও ফলপ্রত্যাশী। টাকা খরচের জন্য জবাবদিহিতা না থাকায় আমাদের সরকারগুলোর সবকিছুতে 'রাজনীতি' এসে ভর করে।

যে-কোনো অভিযানের পরিকল্পনা বা প্রস্তুতির প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—তথ্য (ইন্টেলিজেন্স)। গত কয়েকটি অভিযান পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রয়োজনীয় তথ্যের ঘাটতি নিয়েই ঝটপট করে এসব অভিযানের পরিকল্পনা হয়েছে। ফলে মাঠে নেমে সংশ্লিষ্টরা যা করেছে তা ছিল 'অমাবস্যার রাতে কালো বিড়াল খোঁজার মতো'। মাঠ পর্যায়ে যা দেখেছি তার বর্ণনায় না গিয়ে বলতে পারি—দেয়ার আর নো গুড অর ব্যাড ট্রুপস, বাট দেয়ার আর গুড অর ব্যাড কমান্ডারস। অধিনায়কদের যোগ্যতা, শৃঙ্খলাবোধ ও ইন্টিগ্রিটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। এরপর আসে মনোবল, উদ্যোগ, দায়িত্বজ্ঞান, সততা ও একনিষ্ঠতার কথা। শৃঙ্খলা বাহিনীতে এগুলো প্রয়োজনীয়, বিশেষ করে মাঠপর্যায়ের অভিযানের ক্ষেত্রে আরও বেশি। তা না হলে মাঠে তাদের আচার-আচরণ হবে একটি অস্ত্রধারী গোষ্ঠীর মতো। এ-সময় পরীক্ষা হয় তাদের নেতৃত্বের শৃঙ্খলা, একনিষ্ঠতা, দক্ষতা, প্রশিক্ষণ ও পেশায় পারদর্শিতা। গত দুটি অভিযানের পোস্টমর্টেমে এসব কি বিশ্লেষণ করা হয়েছে? সফলতা-ব্যর্থতার দায়দায়িত্ব নিরূপণ করে পুরস্কার বা শাস্তির কোনো ব্যবস্থা কি নেয়া হয়েছিল? যদি না নেয়া হয়ে থাকে তবে বলি, আগামী অভিযানগুলোর ফলও এর চেয়ে ভালো কিছু হবে না। হবে শুধু টাকার শ্রাদ্ধ এবং আইশৃঙ্খলার আরও দ্রুত অবনতি।

অভিযানের জন্য প্রয়োজন সঠিক গোপন তথ্য ও বিস্তারিত পরিকল্পনা। গোপন তথ্য সংগ্রহের দায়দায়িত্ব গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর। অভিযানের আগে তথ্য সংগ্রহের পর তা সূক্ষ্মভাবে যাচাই-বাছাই করতে হয়। পরে যাচাইকৃত তথ্য বিশ্লেষণ করে অভিযানের পরিকল্পনা করতে হয়। এটা সবাই জানে। বিষয় হলো—এই জানা জিনিসটা কতটুকু ন্যায়নিষ্ঠ ও সততার সঙ্গে করা হয়? করলে কারা করে, কীভাবে করে? সঠিকভাবে করলে ফলাফল শূন্য হয় কেন?

বাংলাদেশে আমার জানামতে আধা ডজনেরও বেশি সামরিক ও বেসামরিক গোয়েন্দা সংস্থা আছে। কিন্তু তাদের কর্মের পরিধি ও কর্মদক্ষতা সম্পর্কে মনে হয় না যে জনগণ কিছু জানে। এর কারণ অনেক। যেমন, এদের সফলতা কিংবা ব্যর্থতা সম্পর্কে খোলামেলা কোনো তথ্য জানা যায় না। সংসদেও গোয়েন্দা বিষয়ে কোনো কমিটি আছে বলে শুনি নি। গণতান্ত্রিক দেশে এ-ধরনের সংসদীয় কমিটি থাকে। অর্থাৎ গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর পদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকতে হবে।

আমাদের দেশে ন্যূনতম তদারকি ও সমন্বয়ের জন্য হলেও সরকারের উচ্চ পর্যায়ে একটা কমিটি থাকা খুব জরুরি। তা না হলে একেক সংস্থা একেক রকম কিংবা বিশেষ উদ্দেশ্যে সম্পূরক তথ্য অথবা নিজের ইচ্ছা অন্যের নামে চালিয়ে (ইন্টেলিজেন্সের ভাষায় বলা হয় 'অটো সাজেশন') দিয়ে প্রশাসনকে প্রভাবিত করতে পারে। বাংলাদেশে বড় গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের অধীন। কিন্তু বাস্তব কারণে তাদের সরাসরি তদারক বা সমন্বয় করার সময় প্রধানমন্ত্রী কোথায়! এসব সংস্থার বেশির ভাগ কাজই আমাদের দেশে রাজনীতিকেন্দ্রিক এবং তাদের আনুগত্যও ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুর প্রতি। ফলে সরকার

বদলের সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও আনুগত্য বদল হয়। যাঁরা আনুগত্য বদল করতে দেরি করেন বা ধরা পড়েন, তাঁদের চাকরি বদল হয়। এখানে অন্যান্য বিষয়ের মতো দেশের স্বার্থের কথা ক্ষমতাসীনদের বিবেচনায় সচরাচর কম আসে, ফলে ক্ষমতা বদলের সঙ্গে সঙ্গে বদল হয় তাঁদের কাজের পরিধি ও টার্গেট। আর গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কর্তারাও তাদের ক্ষমতাসীন প্রভু যা শুনতে চান তা-ই শোনায়। এর জন্য তারা প্রয়োজনে খবর তৈরি বা আবিষ্কার করে কিংবা খবরকে অতিরঞ্জিত করে। তাই আমাদের আইন-শৃঙ্খলার সবচেয়ে দুর্বল দিক হলো এই তথ্য সরবরাহ সংস্থাগুলো। অনেক সময় এরা সময়মতো সরকারকেও সতর্ক করতে পারে না। কিন্তু ঘটনা ঘটার পর এরা বিজ্ঞের মতো নানা মতামত দিতে থাকে। কথায় বলে—তথ্য যেখানে স্বল্প, বিশেষজ্ঞ সেখানে অনেক। ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসে দুটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। একটা হলো তথ্য (ফ্যাক্টস)। অন্যটা মতামত (অপিনিয়ন)। আমরা আছি অপিনিয়ন নিয়ে। ইংরেজিতে বলে—Facts are statements that can be measured, examined, tested and checked for reliability. But opinion is judgement or appraisal of a situation. (বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য তথ্য ও বিবৃতি পরিমাপ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যায়। কিন্তু মতামত হলো কোনো পরিস্থিতির মূল্যায়ন।)

বুঝে না-বুঝে মতামত দেয়া আমাদের জাতীয় চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য। কিন্তু গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে তথ্য-বহির্ভূত মতামত দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। তথ্য ছাড়া মতামত প্রদান থেকে বিরত থাকতে হবে।

আসল কথা হলো—রাজনীতির ও ক্ষমতায় থাকার জন্য নয়, দেশের আইন-শৃঙ্খলা ও সার্বিক নিরাপত্তার জন্য গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে নিয়োজিত করতে হবে। আমাদের দেশে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কাজ অনেকটা অ্যাডহক ভিত্তিতে চলে। গোয়েন্দা সংস্থার জন্য অ্যাডহক অনেকটা বিষের মতো। আর জবাবদিহিতার ঘাটতি বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। প্রাচীন ভারতে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বে তাঁর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বিষ্ণু গুপ্ত ওরফে পণ্ডিত চাণক্য, যাঁর অপবাদসূচক নাম কৌটিল্য। তিনি তাঁর অর্থশাস্ত্র বইয়ে সঠিক গোপন তথ্য সংগ্রহের ওপর বারবার গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেছেন, গুপ্তচরের সহায়তা ছাড়া শাসন-প্রণালীকার্য সুসমাধান হয় না। বিশেষ করে নিয়োগ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, গোয়েন্দা সংস্থায় অত্যন্ত সৎ, দক্ষ, চরিত্রবান লোকদের নিয়োগ করতে হবে। আমাদের দেশে ব্যক্তিগত আনুগত্য ও রাজনৈতিক বিবেচনায় গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর বিভিন্ন পদে নিয়োগ দেয়া হয়। এখানে অনেস্টি, ইন্টিগ্রিটি ও ইফিসিয়েন্সির বাজার মন্দা। কিন্তু কে কার আত্মীয় বা বন্ধু, কে কাকে চেনে বা তোষামোদিতে কতটুকু পটু—এসবের বাজার চাঙ্গা। এ-অবস্থা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি তথা দেশের জন্য বিপজ্জনক।

*প্রথম আলো* ১৬ অক্টোবর ২০০৩

## সরকার বিতর্ক

# বিদ্যমান আইনেই নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব

ব্যক্তি যদি মানসিকভাবে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সৎ না হয় তবে যতই আইন বা নীতি করা হোক না কেন কোনো কাজই হবে না। কমিশন, আইন বা নীতি কোনো কিছুই কাজ করে না। এগুলোকে পরিচালনা করেন একজন ব্যক্তি। সেই ব্যক্তিটি যদি মনে-প্রাণে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন, সৎ ও সাহসী না হয়ে থাকেন তবে কোনোকিছুতেই কাজ হবে না। দুর্নীতি দমন কমিশন গঠিত হয়েছে আজকে প্রায় ছয় মাস হয়ে গেল। কিন্তু এতদিনে তাঁরা একটি দুর্নীতির বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে পারেন নি। কমিশনের আইন, নীতি, লোক সবই দেয়া হয়েছে। কিন্তু নিজেদের মধ্যে ঝগড়া ছাড়া কোনো কাজই তাঁরা করতে পারছে না। কাজ চাইতে হলে দেখতে হবে যে-ব্যক্তিটিকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সেই ব্যক্তিটি কে? ব্যক্তিটি যদি স্বাধীন, সৎ ও সাহসী হন তবে আইনের সীমাবদ্ধতা থাকলেও তাঁর কাছ থেকে কাজ পাওয়া যাবে। দেশে এ-ধরনের মানুষ সংখ্যায় খুবই কম। শিক্ষিত লোকেরা কিছু পাওয়ার আশায় বেশিরভাগ বিভক্ত হয়ে গেছেন দুই রাজনৈতিক দলে। রাজনৈতিক দলগুলো থেকে দাবি উঠেছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ও নির্বাচন কমিশনের সংস্কার করতে হবে। এই সংস্কার-প্রস্তাবগুলো সবই উদ্দেশ্যমূলক। সত্যিকারের সংস্কারের উদ্দেশ্য নিয়ে কেউ বলছেন না। সবকিছু সংস্কার করেও কোনো লাভ হবে না, যদি ঐ পদগুলোতে সৎ ও সাহসী ব্যক্তিকে দায়িত্ব না দেওয়া হয়। যদি কোনো রাজনৈতিক চাপ না থাকে এবং সাহসী ও সৎ ব্যক্তি দায়িত্বে থাকেন, তা হলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিদ্যমান যে-আইন রয়েছে তার মধ্য থেকেই সম্পূর্ণ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ জাতীয় নির্বাচন করা সম্ভব। সুতরাং সংস্কার করলে একেবারে ওপর থেকে মানুষের মগজের মধ্যে সংস্কার করতে হবে। স্বাধীন, সৎ ও সুস্থ মানুষদের কাজ করার সুযোগ করে দিতে হবে।

কঠোর ভূমিকা না নেয়ার অভাবে যেখানে ছোটখাটো বিদ্যমান আইন প্রয়োগ করা যাচ্ছে না সেখানে সংস্কার করে কি লাভ হবে। রাজনৈতিক দলগুলো অযোগ্য লোক, আত্মীয়-স্বজন দিয়ে নিজেদের মতো করে মাঠ সাজিয়ে যাবে। আবার বলে যাবে প্রশাসনকে বদলি করা যাবে না। এভাবে কাজ করলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার দিয়ে কি লাভ। যে-সমস্ত আইন বা নীতি বিদ্যমান আছে তারও বাস্তবে কোনো প্রয়োগ নেই। বর্তমানে নির্বাচনী আচরণবিধিমালা যা আছে তাও মানা হয় না। কঠোরভাবে মানলে এই বিধিমালাই নির্বাচন করার জন্য যথেষ্ট। নির্বাচনে ঋণখেলাপি, কালো টাকার মালিক, খারাপ লোক, সন্ত্রাসীরা প্রার্থী হতে পারবে না—এমন নিয়ম করতে হবে। তা হলে নির্বাচনে সহিংসতা কমে আসবে। রাজনীতি যাঁরা করেন তাঁরা বেশিরভাগ তাঁদের ব্যবসাকে রক্ষা করার জন্য ও ফৌজদারি অপরাধ থেকে বাঁচবার জন্য রাজনীতি করেন।

একবার যাঁরা মন্ত্রী হয়েছেন তারা কেউ কি আর দরিদ্র থেকেছেন? জিতলে নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে, হারলে কারচুপি হয়েছে—রাজনৈতিক দলগুলোর এই মানসিকতা বাদ দিতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার-ব্যবস্থা যদি খারাপই হয় তা হলে যে-দুই দল এতদিন ক্ষমতায় ছিল তারা বাদ দিল না কেন?

রাজনৈতিক দলীয়করণের প্রভাব নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। গত নির্বাচনের সময় পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ হয়েছিল, নির্বাচন কমিশনের চারজন নির্বাচন কমিশনার একজন আরেকজনের সঙ্গে কথা বলেন না। তাঁরা যদি রাজনীতিকদের মতো একজন আরেকজনের সঙ্গে কথাই না বলেন তা হলে সুষ্ঠু নির্বাচন করবেন কীভাবে?

তবে নির্বাচনে কারচুপি করে ফলাফল সম্পূর্ণ পাল্টে ফেলা অসম্ভব ব্যাপার। কারণ নির্বাচনে জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণ থাকে। এখন পর্যন্ত দেশের সকল সাধারণ নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে। আমার পূর্বঅভিজ্ঞতা হলো, দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচনে ইচ্ছা করলেও করচুপি করা যায় না বা ফলাফল উল্টানো যায় না। এমনকি স্বয়ং নির্বাচন কমিশন চাইলেও নির্বাচনের ফল উল্টাতে পারবেন না। কারণ জাতীয় নির্বাচনে সমগ্র জনগণের একটা মত থাকে। সরাসরি অংশগ্রহণ থাকে। জনগণ যেদিকে মত দিচ্ছে ফলাফল সেদিকে যাবে। জনগণের মত পাল্টানো সহজ নয়। একটি-দুটি নির্বাচনে বিচ্ছিন্নভাবে অতিরিক্ত মনোযোগ দিয়ে প্রশাসনের প্রভাব খাটিয়ে নির্বাচনে বিজয় ছিনিয়ে আনা যায়। কিন্তু জাতীয় নির্বাচনে তা সম্ভব নয়।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার যখন দেশ চালাবে তখন তাদের প্রধান কাজ হলো সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনা করা। এই নির্বাচন পরিচালনার জন্য যা যা ক্ষমতা হাতে থাকা উচিত তার সবই তাদের দেয়া উচিত। এমনকি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ক্ষমতাও তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানের হাতে থাকা উচিত। এই ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের হাতে থাকলে কাজে অসুবিধা হয়।

কারণ ক্ষমতা ছাড়ার আগে রাজনৈতিক দলগুলো সেনাবাহিনীকেও দলীয়করণ করে যায়। নির্বাচনের আগে গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে নিজেদের পছন্দের লোক বসিয়ে রেখে যায়। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে হলে সেনাবাহিনীরও সংস্কার করা জরুরি হয়ে পড়ে। এ-কারণে সেনাবাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করার পূর্ণ ক্ষমতা তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানের কাছে থাকা উচিত। নির্বাচনের প্রয়োজনে বা অন্য কোনো প্রয়োজনে সেনাবাহিনীবিষয়ক কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার দরকার হলে প্রেসিডেন্টের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। যা দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করবে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব অন্য সময় প্রধানমন্ত্রীর হাতে থাকলে এতেও কাজের অসুবিধা হয়। কারণ প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রের নানা নির্বাহী কাজ করেন। তাঁর এসব কাজের পাশাপাশি প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। কোনো ব্যক্তি শুধু প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকলেই তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণভাবে মনোযোগ দেয়া সম্ভব।

*সমকাল* ২ জুলাই ২০০৫

# আসতে কাঁদেন যেতেও কাঁদেন

বাংলাদেশে যেসব বিদেশী কূটনীতিক দায়িত্ব পালন করতে আসেন তাঁরা নাকি দু'বার কাঁদেন। প্রথমবার কাঁদেন বাংলাদেশের নাম শুনে। কারণ তাদের জানা তথ্যমতে বাংলাদেশ হল এমন একটি গরিব ও ঘনবসতিপূর্ণ দেশ যেখানে হরতাল, সন্ত্রাস, রোগবালাই, বন্যা, দূষণ লেগেই আছে। ফলে তাঁরা আতঙ্কে কাঁদেন।

কিন্তু দায়িত্ব পালন করতে এসে তাঁরা অভাবনীয় কাণ্ডকারখানা প্রত্যক্ষ করেন। তারা অতি দ্রুত বুঝতে পারেন বাংলাদেশ এমনই এক ব্যতিক্রম, যেখানে তাঁদের জন্য রয়েছে লাটবাহাদুরের কায়দায় বর্ণাঢ্য জীবন কাটানোর অপূর্ব সুযোগ। এখানে তাঁদের অনুগ্রহলাভের জন্য রয়েছে রাজনীতিবিদ, এনজিও, ব্যবসায়ী এবং সুশীলসমাজের তথাকথিত একটি প্রভাবশালী অংশ। এঁদের সহায়তায় এসব কূটনীতিক বেশ ভালোভাবে জেঁকে বসেন। তাঁরা সরকার, সরকারি দল, বিরোধীদল—সবাইকে প্রকাশ্যে তাচ্ছিলের সঙ্গে নানা উপদেশ, পরামর্শ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে হুমকিও দিতে কসুর করেন না। এসব হুমকি-ধামকিকে আমরা 'চাপ' হিসেবে অভিহিত করে নিজেদের ইজ্জতের ওপর থেকে চাপ কমাই। স্থানীয় গণমাধ্যমেও তাঁদের প্রতি এক অভাবনীয় আকর্ষণ প্রকাশ পায়। ফলে তাঁরা বাংলাদেশে তাদের অবস্থানের প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করেন। আর উপভোগ করার বিষয়টি তাঁরা লুকাতেও চান না। এ অবস্থায় এদেশ ছেড়ে যাওয়ার সময় তাঁদের আবার কান্না পায়। তাঁদের মন ভেঙে যায়। কারণ এ-ধরনের শিষ্টাচার ও রীতিনীতি-বহির্ভূত কাজ তথা ক্ষমতাচর্চা, প্রতাপ দেখানোর সুযোগ এবং গুরুত্ব আর কোথাও গিয়ে তাঁরা পাবেন না। আমি বিভিন্ন দেশে ১৬ বছরের বেশি সময় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করেছি। এ-সময়ে হয়তো আমি 'বাংলাদেশে প্রচলিত' কূটনীতি শিখি নি। তবে অন্ধ কিংবা বধির হিসেবে আমি আমার দায়িত্ব পালন করি নি। ফলে যে সামান্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, তার আলোকে দেশের রাজনীতিতে বিদেশী কূটনীতিক ও দাতাদের অযাচিত জামাইআদর দেখে একজন নাগরিক হিসেবে অপমানিত বোধ করি।

মনে পড়ে ইরাকে জাতিসংঘের অস্ত্রপরিদর্শক দলের সাবেক নেতা রিচার্ড বাটলারের কথা। তিনি থাইল্যান্ডে অস্ট্রেলিয়ার রাষ্ট্রদূত ছিলেন। তিনি একবার থাইল্যান্ডের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন। আর যায় কোথায়—সেখানকার প্রেস প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল। রাজনীতিকরাও সোচ্চার হন। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, আমরা কূটনৈতিক মহলে ধারণা পাচ্ছিলাম যে, তাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে দেশ থেকেই বহিষ্কার করা হতে পারে। শেষ পর্যন্ত থাই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাঁকে তাঁর আচরণের জন্য সতর্ক করে দেয়।

আমাদের দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে বিদেশী কূটনীতিক ও দাতাদের খোলামেলা হস্তক্ষেপ ও তাঁদের সংস্পর্শে আসার জন্য কিছু লোকের লজ্জাজনক প্রতিযোগিতা সমান্তরালভাবে চলছে। তবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উত্তরণের পর যে ধরনের জাতীয় গৌরববোধের সংস্কৃতি গড়ে উঠবে বলে দেশবাসী আশা করেছিল, তেমন ইতিবাচক কোনো ধারা দেশে তৈরি হচ্ছে না। গত কয়েকদিন ধরে বিদায়ী মার্কিন রাষ্ট্রদূত মেরি অ্যান পিটার্সকে নিয়ে আশ্চর্যরকম মাতামাতি হয়েছে। দুঃখের বিষয় হল, এর মাধ্যমে আমাদের নীতিনির্ধারক ও সুশীলসমাজের অনেকে জনগণের সামনে এমন ধারণা দিয়ে চলছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা এরূপ কোনো বৃহৎ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের কৃপালাভ যেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের অনুগ্রহ পেলে রাজনীতিক, ব্যবসায়ী ও তথাকথিত সুশীলসমাজের নেতারা নিজেদের কৃতার্থ মনে করেন।

যাঁরা এই মাতামাতি করেন এবং দেশবাসীকে ধারণা দিতে চেষ্টা করেন যে, এসব রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে হয়তো সেসব বড় দেশের কোনো কৃপা পাওয়া যাবে তাঁদের শুধু '৭১-এর ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিতে পারি। সে-সময় এদেশে অবস্থানরত মার্কিন দূতাবাস বাংলাদেশের জনগণের পক্ষে দিনের পর দিন রিপোর্ট পাঠিয়েছিল। কিন্তু সবাই জানেন, মার্কিন কেন্দ্রীয় প্রশাসন তার কী গুরুত্ব দিয়েছে। বর্তমানে অনেকের মধ্যে এ-ধারণার প্রকাশ দেখতে পাই যে, তারা মনে করছেন আমেরিকা বা অন্য কোনো দেশকে খুশি করতে বা রাখতে পারলে ক্ষমতায় থাকতে পারবেন অথবা আসতে পারবেন। উপরে উল্লিখিত পক্ষগুলো সংবাদমাধ্যমকে ব্যবহার করে নিজেদের স্বার্থে এই ধারণা ছড়িয়েছে ও ছড়াচ্ছে। ফলে তারা নিজেদের ঝগড়া-বিবাদ মেটাতে কূটনীতিকদের কাছে বিচারপ্রার্থী হয়, তাদের মধ্যস্থতা কামনা করে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি জনগণ না চাইলে কেউ ক্ষমতায় যেতে বা থাকতে পারে না। জনগণই সবকিছুর মূল।

অপ্রিয় হলেও সত্য, ঢাকায় যাঁরা শক্তিশালী ও উন্নত দেশ থেকে রাষ্ট্রদূত হয়ে আসেন তাঁরা তাঁদের দেশে কেউকেটা তো ননই, এমনকি অনেকে পুরোদস্তুর রাষ্ট্রদূতের মর্যাদাও ভোগ করেন না। তার ওপর উন্নত দেশগুলো সার্ক অঞ্চলকে মর্যাদার দিক থেকে দুই গ্রুপে ভাগ করে নিয়েছে। এক গ্রুপে ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকা। অন্য গ্রুপে অর্থাৎ মর্যাদায় দ্বিতীয় সারিতে রয়েছে বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান ও মালদ্বীপ।

উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, একটি ধনীদেশের রাষ্ট্রদূত যিনি একদা বাংলাদেশে দায়িত্ব পালন করেন, তিনি ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশে গিয়ে আর রাষ্ট্রদূতের মর্যাদা পান নি। ওই মিশনের তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তি হয়ে যোগ দেন। সেই সময় আমি ওই দেশে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ছিলাম। এ-বিষয়টি আমাদের নীতিনির্ধারকদের যে অজানা তা-ইবা বলি কেমন করে। সুতরাং যাঁরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতকে নিয়ে আড়ম্বরপূর্ণ সমাবেশ করতে ব্যাকুল থাকেন, তাঁদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন জাগে বৈকি।

১৯৮৪ সালের আরেকটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। সিঙ্গাপুরে নিযুক্ত তৎকালীন আমেরিকান দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি সেদেশের বিরোধীদলের নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। বিষয়টি নিয়ে পত্রিকায় লেখালেখি হয় এবং তাকে দেশ ছাড়তে হয়েছিল। আমাদের যাঁরা সভা-সমিতি-সেমিনার করে বেড়ান তাদের কারও কারও দায়বদ্ধতা যেন বিদেশীদের কাছে খুব বেশি এবং তা কোনো গোপন বিষয় নয়। উন্নত দেশ ও দাতাদের অর্থে সেমিনার-ওয়ার্কশপ আয়োজন করে কীভাবে জাতীয় স্বার্থ পুরোপুরি সংরক্ষণ সম্ভব তা বোধগম্য নয়। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আমরা হয়তো রাতারাতি বৈদেশিক সাহায্য-সহযোগিতার নির্ভরতা থেকে একেবারেই মুক্ত হতে পারি না, কিন্তু আমাদের তো জাতীয় মর্যাদাবোধ ও আত্মসম্মান থাকা উচিত। যদি জাতীয় গর্ব ও আত্মসম্মানই না থাকে, তা হলে তো কোনো জাতি, কোনো দেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না।

একটি ছোট্ট উদাহরণ দিই। আমাদের দেশে বিদেশী কূটনীতিকরা প্রিভিলেজের যেধরনের অপব্যবহার করেন তা অন্য কোনো দেশে তাঁরা ভাবতেই পারবেন না। তাঁরা ঢাকায় এসে তাঁদের মিশনের সন্নিহিত এলাকায় কর্তৃপক্ষের পরোয়া না করে ইচ্ছেমতো জমি সম্প্রসারণ করেন, রাস্তার ওপর গার্ড বক্স করেন, রাস্তার পাশে বিধিবহির্ভূতভাবে চেইন দিয়ে নিজেদের খেয়ালখুশি মতো নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করেন ভিসাপ্রার্থীদের ফুটপাতের টিনশেডে বসিয়ে রাখা এবং তাদের হয়রানি করার যে রেওয়াজ আমাদের কূটনৈতিক এলাকায় চলছে তা কোথাও দেখি নি। একবার আমি আমার একটি লেখায় এ-বিষয়টি উল্লেখ করেছিলাম। একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা শুধু বিষয়টিকে আমলে নেয়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট দেশী কিংবা বিদেশী কৃর্তপক্ষ এ-ব্যাপারে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখান নি। এর অর্থ হচ্ছে তাঁদের কাছে এসব কোনো ব্যাপারই নয়। কিন্তু বাস্তবতা হলো—এগুলো করতে করতে একপর্যায়ে এসব কূটনীতিক দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অযাচিতভাবে নাক গলান।

সম্প্রতি আমার এক বন্ধু জানালেন, কলকাতায় বাংলাদেশ দূতাবাসের সামনে তাঁর গাড়িটি রেখে তিনি ভেতরে যান। কাজশেষে এসে দেখেন তাঁর গাড়িতে পুলিশ স্টিকার (জরিমানা) লাগিয়ে দিয়েছে। আর আমাদের দেশের চিত্র পুরো উল্টো। এখানে দূতাবাসের সামনে রাস্তা জুড়ে গাড়ি পার্ক করা হয়। দেখার কেউ নেই।

বিদেশী কূটনীতিকদের দায়িত্ব হল বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে নিজ নিজ সরকারকে অবগত করা এবং পরামর্শ দেয়া। কিন্তু এখানে আমরা দেখছি তাঁদের কেউ গভর্নর জেনারেল, কেউ আবার ভাইসরয়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ। তারা প্রকাশ্যে বাংলাদেশের রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সব বিষয়ে মন্তব্য করেন, হেদায়েত করেন। কখন কার কী করতে হবে, এদেশে তারা কী দেখতে চান, কী তাঁদের ভালো লাগে, সুশাসন বলতে তাঁরা কী বোঝেন—আরও কত কী! আর আমাদের কিছু ব্যবসায়ী, সেমিনারজীবী তাঁদের এরূপ তৎপরতা প্রদর্শনের সুযোগ করে দেন এবং অনবরত উৎসাহ যোগান। আমাদের গণমাধ্যম এসব নিয়ে প্রশ্ন না তুলে, যা তাদের দায়িত্ব, বরং ফলাও করে প্রচার করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মার্কিন ডাক্তার (সার্জন) জে এম ক্যামারন, যিনি পরে মনোবিদ হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছেন, তাঁর একটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করছি। তিনি বলেছেন, There can be no fully constituted nation whose people are totally lacking in pride, of what they are proud of, the intensity of their pride, the means and methods by which they proclaim their virtues, are the indicators of how they will maintain their sovereignty and also the factors that determine the tenor of international relationship.

সবশেষে বলব, কোনো লোক বা দেশকে যদি অস্ত্রশক্তি প্রয়োগ করে পরাজিত করা হয় তবে সে-লোক বা তার পরের প্রজন্ম কোনো-না-কোনো সময় আবার উঠে দাঁড়াতে পারে। কারণ তার মাটিই তাকে অনুপ্রেরণা যোগাবে। কিন্তু কাউকে যদি টাকা-পয়সা দিয়ে বশ করা যায় তবে সে আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। টাকার মোহই তাকে কৃতদাসের মতো বশীভূত করে রাখে।

*যুগান্তর* ১৭ জুলাই ২০০৩

# সন্ত্রাসের রাজনীতিকীকরণ ও রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচারের পথে অন্তরায়

ইন্টারপোল ও এফবিআইয়ের তিন কর্মকর্তা ঢাকায় এসে তদন্তকাজ শুরু করেছেন। সবগুলো পত্রিকায়ই এই খবরটি ফলাও করে ছাপা হয়েছে। ইন্টারপোলের সদস্য বাংলাদেশ। তাই তাদের অনুরোধে ইন্টারপোল কর্মকর্তাদের আগমন প্রচলিত ধারার বাইরে কিছু নয়। একজন আরেকজনকে সাহায্য করবে, এটাই স্বাভাবিক। তবে দেশে বিরাজমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ইন্টারপোল ও এফবিআই সদস্যদের ঢাকায় আসার ভিন্ন একটি তাৎপর্যও রয়েছে। বিশেষত, তাঁরা এসেছেন গত ২১ আগস্ট বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার জনসভায় গ্রেনেড হামলা ঘটনার তদন্তে সহযোগিতার জন্য। এর আগে গত ৩০ জানুয়ারিও এঁদের দুজন এসেছিলেন। তখন তাঁরা ২১ আগস্টের গ্রেনেড-হামলা ও হবিগঞ্জ গ্রেনেডহামলার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। সম্প্রতি তাঁদের আবার আসার জন্য বাংলাদেশ অনুরোধ জানালে তাঁরা সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছেন।

২১ আগস্ট গ্রেনেড-হামলাটি ছিল ইদানীংকালের সবচেয়ে নৃশংসা ঘটনা। এই সমাবেশে কয়েক মিনিটের মধ্যে অনেকগুলো গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল যা বাংলাদেশে কোনো রাজনৈতিক সভায় এই প্রথম। এর সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার দেশে ও বিদেশে সবাই চেয়েছেন। জনসাধারণ এবং অন্য রাজনৈতিক দলগুলোর একটি দাবি ছিল, বাইরের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে এসে তদন্ত করা হোক। কারণ সবাই জানেন, বাংলাদেশে সেই বিশেষজ্ঞ-জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব আছে। আদালতে ব্যবহৃত সাক্ষ্যপ্রমাণ (ফরেনসিক) সংগ্রহ, আঙুলের ছাপ ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিদেশী গোয়েন্দাদের কাজ অনেক বেশি ফলপ্রসূ। তাঁদের কাছে এসব তদন্ত বিশ্লেষণের জন্য অত্যাধুনিক জ্ঞান ও দক্ষতা আছে। তা ছাড়া অতীতে দেখা গেছে, বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের

সুষ্ঠু তদন্ত হয় না। তদন্তে দোষী ব্যক্তিদের রাজনৈতিক কারণে চিহ্নিত করা হয় না বা করা যায় না। জাতীয়ভিত্তিক আলোড়ন সৃষ্টিকারী অপরাধমূলক ঘটনাগুলোর প্রায় অনেকগুলোরই সুষ্ঠু তদন্ত ও পরে বিচার হয় নি। বোমা-গ্রেনেড আক্রমণের ঘটনাগুলোর সুরাহা না হলে কেবল গুজব ছড়ায়, অনিষ্পন্ন জল্পনা-কল্পনা (আনরিজলভড রিউমার) চলতে থাকে, যেটা কাম্য নয়। সেটা বন্ধ করা এবং সবার কাছে গ্রহণযোগ্য তদন্তের তাগিদেই হয়তো ইন্টারপোল ও এফবিআইকে আনা হয়েছে।

এটা ঠিক যে, দেশের গোয়েন্দা সংস্থা সিআইডি তদন্ত করছে। তারা কিছু অগ্রগতি হয়েছে বলে দাবিও করছে। সিআইডি সদস্যরা রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত হয়ে তদন্ত করছেন বলে জনসাধারণ ও বিরোধীদলগুলোর ধারণা থেকে যায়। অতীতে অনেক ঘটনার তদন্ত বিশ্বাসযোগ্যতা পায় নি। বিগত দিনে অনেক ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত হয়েছে। কিন্তু ঘটনার কারণ উদ্ঘাটন করা যায় নি। এর উদ্দেশ্য ও দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা যায় নি। তদন্তকারী কর্মকর্তাদের যোগ্যতা ও সততা নিয়ে জনগণ প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের ওপর জনগণ পুরোপুরি আস্থা রাখতে পরেন না। এ পরিস্থিতি কারও কাম্য নয়। সবাই চান সত্য প্রকাশিত হোক। সরকারও চায়। তাই সবার কাছে গ্রহণযোগ্য তদন্তের জন্য ইন্টারপোল ও এফবিআইকে ডাকা হয়েছে।

এসব ব্যাপারে ক্ষমতাসীন ও রাজনীতিবিদদের ওপর আস্থা থাকে না কেন? আমার মনে হয়, এজন্য মূলত দায়ী রুগ্ণ রাজনীতি, যাকে সচরাচর বলা হয় পলিটিসাইজেশন অব ক্রাইম অ্যান্ড ক্রিমিনালাইজেশন অব পলিটিক্স (সন্ত্রাসের রাজনীতিকীকরণ ও রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন)। এ-দুটির কারণে আমাদের দেশে সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচারের ব্যাঘাত ঘটে। সেটা দূর করার জন্য সব সরকারেরই সচেষ্ট হওয়া উচিত। তা না হলে জনগণ আইনের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে এবং আইন নিজের হাতে তুলে নেয়, যা অনেক সময় দেখা যায়। সেটা কোনো সমাজ ও জাতির জন্য মঙ্গলজনক নয়। ক্রাইম ইজ ক্রাইম, অপরাধ অপরাধই এবং আইনের ওপর কিংবা নিচে কেউ নয়, সভ্য দেশে সবাইর আইনের চোখে সমান হওয়া উচিত। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সত্য যে, আমাদের দেশে আইন সমভাবে প্রয়োগ করা হয় না। এই কারণে প্রভাবশালী ও বিত্তশালীরা লাভবান ও উপকৃত হয়। রাজনীতির ছত্রছায়ায় দুর্বৃত্ত লালিত হয় বলেই আমাদের রাজনীতি রুগ্ণ হয়ে পড়েছে। দুর্নীতি ও সন্ত্রাস দুটোই যমজ ভাই। দুর্নীতি দমনের কাজটা যেমন ওপর থেকে শুরু করতে হয়, তেমনি সন্ত্রাস দমনের কাজটিও শুরু করতে হয় ওপর থেকেই। সেটা করা না হলে দুর্নীতি ও সন্ত্রাস দমনের নামে সময় ও সম্পদের অপচয় হয়।

ইন্টারপোল, এফবিআইসহ সকল তদন্তকারী দলেরই কাজের স্বচ্ছতা থাকা উচিত। তাদের তদন্তের ফলাফল জনসমক্ষে তুলে ধরা উচিত। বিশেষভাবে লক্ষ

রাখা উচিত কাউকে যেন অন্য কোনো উদ্দেশ্যে বলির পাঁঠা বানানো না হয়। যে-কোনো হত্যা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সুষ্ঠু বিচার হওয়া উচিত। বিচার ও উপযুক্ত শাস্তি না হলে এই গ্রেনেড-বোমা হামলাসহ অন্যান্য সন্ত্রাসী কার্যকলাপের অশুভ আবর্ত থেকে দেশ বের হয়ে আসতে পারবে না, এসব নৃশংস হত্যাকাণ্ড বারবার ঘটবে।

অনেক সময় দেখা যায়, তদন্ত সুষ্ঠু হলেও নানা কারণে বিচার সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় না বা হচ্ছে না। সুষ্ঠু বিচারের অন্তরায় দূর করতে হবে। একটি সুস্থ ও ন্যায়নীতিমূলক সমাজ ও জাতি গড়ে তোলার জন্য এটা প্রয়োজন। তাই বলা হয়, বিচার হচ্ছে সত্যের স্বয়ং প্রকাশ (জাস্টিস ইজ ট্রুথ ইন অ্যাকশন।)

*প্রথম আলো* ২৫ জুন ২০০৫

## বাংলাদেশে গণতন্ত্র একটি প্রহসন

বিশ্বখ্যাত ইংরেজ কবি ও নাট্যকার শেকসপিয়ার তাঁর একটি কবিতায় বলেছেন, "দা ওয়েট অব দিস স্যাড টাইম উই অট টু ওবে। স্পিক হোয়াট উই ফিল নট হোয়াট উই অট টু সে।" অর্থাৎ "এই দুঃসময়ের ভার আমাদেরকেই বইতে হবে। আমাদের যা অবশ্যই বলা উচিত তা নয় বরং আমাদেরকে সেকথাই বলতে হবে যা আমরা অনুভব করব।" বাংলাদেশের রাজনৈতিক দিগন্তে এই মুহূর্তে গৃহযুদ্ধ, বিপ্লব, অভ্যুত্থান বা বাইরের সামরিক আগ্রাসনের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তবে দেশে সবকিছু ঠিকঠাক চলছে এবং উদ্বেগের কোনো কারণ নেই এটা বলাও হবে সত্যের অপলাপ। বলা হয়ে থাকে, না জানলে আরামে থাকা যায়। আরেকটা প্রবাদ আছে—যাঁরা বোঝেন ও জানেন তারা হতভাগা। বর্তমান অবস্থায় এই হতভাগাদের কেউ হয়তো এই বলে স্বস্তি পেতে পারেন, "শুকরিয়া আদায় করুন, সামনে আরও খারাপ সময় আসছে।"

আমাদের জনগোষ্ঠীর স্তরবিন্যাস থেকেই সম্ভবত দেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের পূর্বাভাস ও কারণ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু এই সংকট নিরসনের ব্যবস্থাপত্র দেয়া যে-কোনো বিশেষজ্ঞের জন্যই দুরূহ। বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের প্রাজ্ঞতা দেখাতে এমন সব কথা বলেন যা বেশির ভাগ লোকের বোধের বাইরে থেকে যায়। এঁদের বেশির ভাগই কোনো না কোনোভাবে ফায়দা লুটতে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত। কেউ-কেউ আবার বেসরকারি সংস্থা বা এনজিওর (যারা আবার সরকারের ভেতরে সরকার হয়ে উঠেছে) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যা থেকে তাঁরা পান নানা সুযোগ-সুবিধা। আবার একদল সরকারি কর্মকর্তা আছেন যাঁরা বৃহস্পতিবার অবসর গ্রহণ করে শনিবারই যোগ দেন ব্যবসা, রাজনীতি, এনজিও বা কনসালটেন্সি ফার্মে যা আগে থেকেই ঠিক করা থাকে। নৈতিকতার চেয়ে স্বার্থ হাসিলই তাঁদের কাছে বড়।

গণতন্ত্র মানে সংঘবদ্ধ কিছু লোক, বক্তৃতা, নির্বাচন বা দুস্থদের কিছু চাল-গম বিলানো নয়। গণতন্ত্র এগুলোর চেয়ে অনেক বড় কিছু। গণতন্ত্রের সংশ্লিষ্টতা

অন্ততপক্ষে জনগণের জীবনযাত্রা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, খাদ্য, শিক্ষা, বিচার ও কর্মসংস্থানের সঙ্গে। এগুলো পূরণ হলে সেটাকেই নিদেনপক্ষে গণতন্ত্র বলা যাবে। কিন্তু আমাদের দেশে কিছু লোক রাজনীতিকে জীবিকা হিসেবে নিয়েছেন। রাজনীতি তাঁদের কাছে জীবনধারণ ও মুনাফার হাতিয়ার। নির্বাচনের সময় চাতুর্য, ধূর্তামি, ব্যাপক অর্থ ও পেশিশক্তি ব্যবহার করে তাঁরা পরস্পরের কাছ থেকে গণতন্ত্রের মুখোশ পরে ক্ষমতা দখল করে, যে প্রক্রিয়ায় থাকে না সাধারণ মানুষের সত্যিকার অংশগ্রহণ। ফলে ক্ষমতায় যাওয়ার পর জনগণকে তারা আর তোয়াক্কা করে না। মনে হচ্ছে, বাংলাদেশের রাজনীতির সাফল্যের গোপন রহস্য নিজের স্বার্থ হাসিলে দেশ, সরকারি কর্মকর্তা ও অপরাধীসহ সব উপায়কে কাজে লাগানো। কপটতা, প্রতারণা, নগদ অর্থ ও ভোটকেন্দ্র দখলের মতো নির্বাচন হচ্ছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির উপজাত। অনৈতিক কোনো কাজ কোনো সভ্যসমাজে রাজনৈতিক বা আইনগত বিচারে সঠিক হতে পারে না। রাজনীতিতে অর্থ ও পেশিশক্তি ব্যবহারের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব অবশ্যই বিরাট উদ্বেগের কারণ। একটা সাধারণ ধারণা প্রচলিত আছে যে, ধড়িবাজ ব্যবসায়ী (ফ্লাই বাই নাইট), অপরাধী ও স্বার্থান্বেষীদের দ্বারাই রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত হয়। রাজনীতি হচ্ছে দুর্নীতি, নোংরামি, আর ভাঁওতাবাজির খেলা, যা ভালো মানুষকেও খারাপ করে ফেলে। অর্থ ও পেশিশক্তির জোরে বিবেকবর্জিত রাজনীতিবিদ এমনকি অপরাধীরা নির্বাচিত হয়ে সংসদে আইনপ্রণেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়ে ভালো মানুষের নৈতিক সমতা অর্জনের চেষ্টা করে। নতুন পদমর্যাদাকে কাজে লাগিয়ে সেই ব্যক্তি নিজের জন্য, নিজের পরিবারের জন্য এবং বন্ধু-বান্ধবদের জন্য আরও সম্পদের পাহাড় গড়তে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। নিজের নির্বাচনী এলাকায় গড়ে তোলেন একটা সুবিধাভোগী চক্র। তাঁর সব কর্মকাণ্ড যেন দেশের সব আইনের ঊর্ধ্বে। কারণ তিনি যে একজন আইনপ্রণেতা!

এক দুর্নীতিপরায়ণ একনায়ক আমাদের ওপর চেপে বসেছিল দীর্ঘ ৯ বছর। তারপর বিগত দশকে ছিল দু'টি কথিত গণতান্ত্রিক সরকার। কিন্তু আগের সব ক্ষত এ-সময়ও ছিল অব্যাহত। এমনকি বহু ক্ষেত্রে ক্ষত আরও বেড়ে গেছে। জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো পৌঁছে গেছে ধ্বংসের কিনারায়। গণতন্ত্রের উচ্ছ্বাস জনজীবনের সব ক্ষেত্রে সৃষ্টি করেছে বিশৃঙ্খলা ও অনিয়ম, যা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে উন্নয়নের। আইনের শাসন হয়ে পড়েছিল সুদূরপরাহত। ক্ষমতার জোরে অযৌক্তিক ও অসঙ্গত শক্তি প্রয়োগ করা হয়ে দাঁড়িয়েছে নিয়মিত ঘটনা। বিরোধীপক্ষ দমনের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে শাসকদলের 'মিলিশিয়ায়' পরিণত করার প্রবণতা আইন-শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে গুরুতর সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে এসব রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হয়ে পড়েছে অকার্যকর। আমাদের দেশের শাসক শ্রেণী মনে করে, রাষ্ট্রীয় সম্পদ আর ক্ষমতাসীনদের সম্পদ এক ও অভিন্ন। দেশের প্রকৃত সমস্যা সম্পর্কে রাজনৈতিক নেতৃত্ব সম্পূর্ণ উদাসীন। দেশের সমস্যা নিয়ে ভাবার

পরিবর্তে তাঁরা ব্যস্ত থাকেন নিজের স্বার্থ হাসিল, পরস্পরের প্রতি কাদা-ছোড়াছুঁড়ি এবং যে-কোনো উপায়ে ক্ষমতা দখলের চিন্তায়। ক্ষমতায় গেলে তাঁদের একমাত্র নীতি হয়ে দাঁড়ায় নিজেদের ভাগ্য গড়া। আর কোনো সমস্যা দেখা দিলে তাঁরা অবলম্বন করেন নাৎসি নীতি। গণতন্ত্রের এ-ধরনের অনুশীলন দেশে সৃষ্টি করেছে দুর্নীতি ও আইন-শৃঙ্খলাবিহীন অরাজক পরিবেশ।

হাইতির জনসংখ্যা ৭০ লাখ। দেশটির রাজনীতি ও অর্থনীতি ১৫০টি পরিবারের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে কথিত আছে। রাজনীতি ও অর্থনীতির বিচারে হাইতির সঙ্গে বাংলাদেশের রয়েছে সামঞ্জস্য। আমাদের গোলার্ধে আমরা সবচেয়ে দরিদ্র দেশের বাসিন্দা। আমাদের দেশের লোকসংখ্যা ১৪ কোটি। কিন্তু আমাদের রাজনীতি ও অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে মাত্র কয়েকশ পরিবার। এখানে রয়েছে বিবেকহীন রাজনীতিবিদ, সরকারি কর্মকর্তা ও মাফিয়া ব্যবসায়ীদের মধ্যে কলুষিত এক চক্র। তারা সবাই মিলে সরকারি অর্থসম্পদ লুটপাটসহ দুর্নীতির স্বর্গরাজ্য গড়ে তুলেছে। আমাদের উন্নয়ন-প্রচেষ্টা কাঙ্ক্ষিত সুফল বয়ে আনে না এই সর্বগ্রাসী দুর্নীতির কারণে। বাংলাদেশের প্রশাসন ও অর্থনীতি আজ দুর্নীতির কাছে সম্পূর্ণ জিম্মি। ফান্ড বিতরণ ও খরচে হয় দুর্নীতি, প্রকল্প বরাদ্দের ক্ষেত্রে দুর্নীতি, কর আদায়ে দুর্নীতি, লাইসেন্স ইস্যু করার ক্ষেত্রে দুর্নীতি। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ ও বদলির ক্ষেত্রে চলে দুর্নীতি। দুর্নীতির এ-তালিকা আসলে অনেক অনেক বড়। অনেক উন্নত দেশ বাংলাদেশকে মনে করে উচ্চ ঝুঁকি ও উচ্চ জালিয়াতির দেশ হিসেবে, যেখানে 'জেনুইন' দলিলপত্রও পাওয়া যায় প্রতারণার মাধ্যমে।

বাংলাদেশে বস্তুগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্নীতি এতই ব্যাপক যে, সরকার ও জনগণ উভয়শ্রেণীই এটাকে রাজনীতি, প্রশাসন ও ব্যবসাক্ষেত্রে জীবনধারণের উপায় হিসেবে মেনে নিয়েছে। কোন জায়গা থেকে যে দুর্নীতি নিয়ে শুরু করব সে-ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়াই জটিল। অধ্যাপক আলবার্ট আইনস্টাইন অবশ্যই এটা জেনে দুঃখ পেতেন যে, বাংলাদেশীরা তাঁর 'আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব'কে পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রয়োগ না করে অন্যভাবে প্রয়োগ করেছে। কারণ এখানে সবকিছুই 'ফর দ্য রিলেটিভস বাই দা রিলেটিভস'। ব্যবসা-বাণিজ্য, সরকারি চাকরি বা রাজনীতি সব ক্ষেত্রেই একই অবস্থা। বাংলাদেশে কোনোকিছু অর্জনের জন্য আপনি কতটুকু যোগ্য, সেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আপনি কার পরিচিত, সর্বোপরি আপনি কার আত্মীয়। তবে আমি আলোচনা করতে চাই শুধু বস্তুগত দুর্নীতি নিয়ে। কারণ এটা বোধগম্য ও দুর্নীতির ফলে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে দেখা দেয় অবর্ণনীয় দুর্ভোগ। প্রথমে দুর্নীতি শব্দের ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন। ব্যাপক অর্থে দুর্নীতি বলতে ঘুষ দেয়া-নেয়া না, নিজের স্বার্থে ক্ষমতা ও প্রভাবের অপপ্রয়োগকেও বোঝায়।

এক্ষেত্রে আমি প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনকে উদ্ধৃত করতে চাই। তিনি বলেছিলেন, "প্রায় সব মানুষই বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারে। কিন্তু আপনি যদি একজন মানুষের চরিত্র পরীক্ষা করে দেখতে চান, তবে তাকে ক্ষমতা দিন।" বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কথাটা নির্জলা সত্য। কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানীর মতে, যে-ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা আছে, সে যে-কোনো ধরনের স্বার্থ হাসিলের জন্য সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করে। এটাই হচ্ছে দুর্নীতি। এই সংজ্ঞার আওতায় দুর্নীতি প্রধানত তিন ধরনের। প্রথমত, ঘুষ। বিশেষ বিবেচনা বা ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের বিনিময়ে কোনো ব্যক্তি যখন অন্য কোনো ব্যক্তি বা তার পরিবারকে অর্থ বা তার সমপর্যায়ের কোনো সুবিধা প্রদান করে সেটাকেই ঘুষ বলে। দ্বিতীয়ত, চাপ প্রয়োগ করে অর্থ আদায়। এটা হচ্ছে সদয় দৃষ্টির বিনিময়ে কারও কাছ থেকে অর্থ বা সমপর্যায়ের সুবিধা আদায় করা। তৃতীয়ত, চুরি। এটা হচ্ছে ক্ষমতার অপব্যবহার করে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকারি অর্থ সম্পদ আত্মসাৎ করা। ঘুষ নেয়া বা অবৈধ উপয়ে অর্থ উপার্জন হচ্ছে 'গ্রিজের' মতো। এটা ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য এমনকি সরকারি অফিস-আদালতে বৈধ কাজও জটিল হয়ে পড়ে। ঘুষ বা কমিশন না দিলে সব কর্মকাণ্ডই হয়ে পড়ে স্থবির। কোনো কোনো অর্থনীতিবিদের মতে, বাংলাদেশের জিএনপির (মোট জাতীয় উৎপাদন) এক-তৃতীয়াংশই 'কালো টাকা', যা আসে ঘুষ, কমিশন, চোরাচালান ও অন্যান্য অবৈধ কর্মকাণ্ড থেকে। অধিকাংশ ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ ও সরকারি কর্মকর্তাই অর্থ ও ক্ষমতার দ্বারা প্রভাবিত। কারণ অর্থ মানে আরও ক্ষমতা, আর আরও ক্ষমতা মানে আরও অর্থ। সমাজে মর্যাদার আসনে বসার জন্যও কাজে লাগানো হয় অর্থ ও ক্ষমতা। যেমন, কাস্টমস, ট্যাক্সেশন ও পুলিশ কর্মকর্তারা অত্যন্ত ক্ষমতাধর। ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে তাঁরা জনগণের কাছে অর্থ দাবি করতে পারেন। চাপ প্রয়োগ করে তা আদায়ও করতে পারেন। বাংলাদেশে সিভিল সার্ভিসে যোগদানে ইচ্ছুক বেশির ভাগ সম্ভাবনাময় প্রার্থীরই পছন্দের ক্ষেত্র আমার জানামতে এগুলো। এসব ক্ষেত্র তাদের কাছে পরিচিত 'ওয়েট ডিপার্টমেন্ট' হিসেবে। তারা মনে করে, এসব ডিপার্টমেন্টে চাকরি পেলে সহজেই অতিরিক্ত আয় করা সম্ভব। দেশে আমলাতন্ত্র ও রাজনৈতিক নৈরাজ্য দিন-দিনই বেড়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে এমন সব বিধিবিধান করা হচ্ছে যা প্রকারান্তরে ক্ষমতাকে আরও কেন্দ্রীভূত করে। দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে জনগণকে উন্নত সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা দেয় না। করদাতাদের অর্থে নানা সুযোগ-সুবিধা দিয়ে শুধু শাসকদলের সদস্য ও আমলাদেরই নিয়োগ ও পদোন্নতি দেয়া হয়।

গণতন্ত্রের নামে রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন এবং অপরাধ ও দুর্নীতিকে রাজনীতিকীকরণ সমাজে ভয়াবহ নারকীয় প্রভাব তৈরি করে যার ফলে উন্নয়ন, দারিদ্র্য দূরীকরণ, আইন-শৃঙ্খলা সমস্যার সমাধানকে অসম্ভব করে তোলে। ফলে সমস্যা আরও জটিল হয়। গণতন্ত্রের অর্থ শুধু অবাধ নির্বাচন, সংসদ, সংবাদপত্রের

স্বাধীনতা, মানবাধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা ইত্যাদিই নয়। জনগণের মূল চিন্তার বিষয় এখন শান্তি, নিরাপত্তা, দারিদ্র্য, অপরাধ, ঘুষ, অবৈধ কমিশন, খাদ্য, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, বিচার এবং আইনের শাসনের মতো মৌলিক বিষয়গুলো। এসব মৌলিক সমস্যা মিটলেই কেবল আমরা অন্যান্য অধিকার ও সত্যিকার গণতন্ত্রের কথা চিন্তা করতে পারি। গাই ফকসের একটি কথা দিয়ে এই নিবন্ধ শেষ করতে চাই। তিনি বলেছেন, "ভয়াবহ রোগের জন্য প্রয়োজন ভয়াবহ প্রতিকার ব্যবস্থা।" পরিশেষে বলতে চাই, হয়তো পরিবর্তন আসবে। তবে তা শান্তিপূর্ণ হবে না সহিংস হবে সেটা নির্ভর করবে আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের ওপর!

*যুগান্তর* ৯ মে ২০০৪

## গ্রেনেড হামলার ঘটনায় দেশের ভাবমূর্তি আরও ক্ষতিগ্রস্ত হবে

**প্রথম আলো** *গত ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগের সমাবেশে গ্রেনেড হামলার ঘটনাটি আপনি কীভাবে দেখেন?*

**মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী (অবঃ)** ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলা দেশ ও জাতির জন্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এটি একটি গুরুতর অপরাধ। যারা এ হামলা করেছে তাদের আমি দেশদ্রোহী ও জাতির শত্রু বলে মনে করি। যারা এটি করেছে তারা দেশকে অস্থিতিশীল করতে চায়, গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে চায়।

এ-ঘটনার যে-অভিঘাত জনগণের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে তার সঙ্গে আমি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট, একই বছরের ৩ থেকে ৭ নভেম্বরের ঘটনাবলি এবং ১৯৮১ সালের ৩০ মে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হত্যার ঘটনার সাদৃশ্য দেখতে পাই। ওই ঘটনাগুলোর পর সাধারণ নাগরিকদের মনের যে-অবস্থা হয়েছিল, যে-আতঙ্ক, শঙ্কা ও অনিশ্চয়তাবোধের সৃষ্টি হয়েছিল, এ-হামলার পরও একই ধরনের পরিবেশ-পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। যারা এ-ঘটনা ঘটিয়েছে, তারা সুপরিকল্পিতভাবে দেশকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে চায়।

**প্রথম আলো :** *আগের যে তিনটি ঘটনার কথা আপনি বললেন, সেগুলো ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। ২১ আগস্টের হামলা হয়েছে প্রকাশ্য দিনের বেলায় জনসমাবেশে। দিনেদুপুরে বিরোধীদলীয় নেতাকে হত্যার এ-চেষ্টা অকল্পনীয়।*

**জেনারেল মইন** আপনি ঠিকই বলেছেন, এরকম ঘটনা এটাই প্রথম। আমি যেগুলোর উল্লেখ করেছি সেগুলো ঘটেছিল রাতে এবং সেনাবাহিনীর ভেতর থেকে। দেখুন, গত ১৯৯৯ সাল থেকে এ-পর্যন্ত অনেকগুলো গুরুতর বোমা-হামলার ঘটনা ঘটেছে। পত্রপত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী ১৪টি বোমা-হামলার ঘটনায় এ-পর্যন্ত মারা গেছেন প্রায় ১৪০ জন। আহত হয়েছেন ১ হাজারেরও বেশি। কিন্তু কোনো ঘটনারই কূলকিনারা হয় নি। প্রতিটি ঘটনার পরপরই অনেক বক্তৃতা-বিবৃতি হয়, প্রথমে পুলিশ, তারপর ডিবি, তারপর সিআইডির হাতে তদন্তের ভার দেয়া হয়,

তারপর আর কিছু জানা যায় না। কোনো রহস্যই উদ্ঘাটিত হয় না। কোনো বিচার নেই, অপরাধীদের শাস্তি নেই। ফলে যারা এসব ঘটায় তারা উৎসাহ পায়, তাদের সাহস বাড়ে, তারা বেপরোয়া হয়ে যায়। তারা মনে করে অপরাধ করে শাস্তি এড়ানো সম্ভব। তাই একটার পর একটা বোমা-গ্রেনেড ও অন্যান্য সন্ত্রাসী হামলা ঘটেই চলেছে।

**প্রথম আলো :** *বিচার বা শাস্তি হয় না কেন?*

**জেনারেল মইন** আমাদের আইন প্রয়োগকারী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর অযোগ্যতা-অদক্ষতা একটা কারণ। তাদের যথাযথ জ্ঞান, প্রশিক্ষণ ও মোটিভেশনের অভাব আছে। আরেকটা কারণ হচ্ছে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি। দেখুন, আমি কোনো দলীয় লোক নই। আমার বিবেকের কাছে আমি একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি। কিন্তু নৈতিকতার মহাসংকটে নিরপেক্ষ থাকা যায় না। আমি যদি বলি, এ-ধরনের মারাত্মক অপরাধের ক্ষেত্রে সরকারের তরফ থেকে যখন কোনো কার্যকর পদক্ষেপ দেখা যায় না, তখন জনগণ সরকারকে দায়ী মনে করে। আমি বলছি না সরকার দায়ী। কিন্তু জনগণের মনের ধারণা বা উপলব্ধি সেরকমই হয়ে যায়, যখন তারা দেখতে পায় সরকার কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে না।

**প্রথম আলো** *আওয়ামী লীগ আমলে বোমা হামলায় অনেক মানুষ মারা গেছে, বিএনপির আমলেও মারা যাচ্ছে। কোনো আমলেই অপরাধীদের সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে বিচার করা হচ্ছে না।*

**জেনারেল মইন** হ্যাঁ, উভয় সরকারের আমলেই জনগণ দেখে আসছে সরকারের তরফ থেকে কোনো পদক্ষেপ নেই। সে-কারণে জনমনে কিছু অনিষ্পন্ন জল্পনা-কল্পনা (আনরিজলভড রিউমার) থেকে যায়। অন্তত এসব রিউমার দূর করতে হলেও সরকারকে কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে। কী ঘটেছে তা জনগণকে জানাতে হবে। অপরাধীদের ধরতে হবে, আইনানুগ বিচার করে তাদের শাস্তি দিতে হবে। তা না হলে জনমনে এমন একটা ধারণা জন্মে যে, সরকার নিজের স্বার্থে চায় না এসবের সুরাহা হোক।

**প্রথম আলো** *কোনো সরকারই কোনো ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারছে না, এটা তো অবিশ্বাস্য মনে হয়!*

**জেনারেল মইন** দেখুন, রাজনীতি দুর্নীতি আর সন্ত্রাসের যে একটা অঙ্গাঙ্গি মিলন বাংলাদেশে ঘটে গেছে, তার ফলে এই বোমা-হামলা ও অন্য সন্ত্রাসীরা ঘটনাগুলো রহস্যাবৃত থেকে যাচ্ছে। তদন্ত হচ্ছে না, অপরাধীরা ধরা পড়ছে না, তাদের বিচার হচ্ছে না। এসব ঘটনায় যদি রাজনীতি আর দুর্নীতি না থাকত তা হলে অবশ্যই সবকটি ঘটনার সঠিক তদন্ত হতো, অপরাধীদের ধরা হতো, তাদের বিচার করে শাস্তি দেয়া যেত। আমি একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারি। ১৯৭২ সালে আমি ছিলাম সেকেন্ড বেঙ্গলের অধিনায়ক, আমাকে বলা হলো বিহারি-অধ্যুষিত মিরপুরে অনেক অস্ত্র ও গোলাবারুদ বিহারিদের কাছে এখনও রয়ে গেছে, সেগুলো উদ্ধার করতে হবে। ভারতীয় সেনাবাহিনী সেখান থেকে চলে

যাওয়ার পর আমার লোকেরা সেখানকার দায়িত্ব নেয়। ৩০ জানুয়ারি কিছু পুলিশসহ সেনাসদস্যরা সেখানে যায় অস্ত্রধারীদের গ্রেপ্তার করতে। বিহারিরা অতর্কিতে এইচই-৩৬ গ্রেনেড দিয়ে তাদের ওপর হামলা করে। এতে প্রায় ৪২ জন প্রাণ হারায়, অনেকে আহত হয়। এরপর আমরা সেখানে অভিযান চালাই, কয়েক হাজার টন অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করি, অনেক সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করি এবং এ-সমস্যা চিরতরে সমাধান করি। তখন সেখানে কোনো রাজনীতি বা দুর্নীতি ছিল না বলেই আমরা সমস্যাটি সুরাহা করতে পেরেছি। তাই একজন পেশাদার সৈনিক হিসেবে আমি মনে করি, সন্ত্রাস দমনের ক্ষেত্র থেকে রাজনীতি ও দুর্নীতি যদি দূর করা যায়, তা হলে এসব বোমা-হামলা বা অন্যান্য সন্ত্রাস অনেকটাই কমে যাবে।

**প্রথম আলো** *একটা দেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিরোধীদলীয় নেত্রীকে হত্যা চেষ্টার ঘটনা তো একটা রাজনৈতিক ঘটনা, সাধারণ সন্ত্রাস নয়।*

**জেনারেল মইন** এ-ঘটনার পেছনে একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অবশ্যই আছে। এদেশে দুটি বড় দল পর্যায়ক্রমে জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে দেশ শাসন করে আসছে। শেখ হাসিনা একটির প্রধান নেত্রী। তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, এখন প্রধান বিরোধীদলীয় নেত্রী। তাঁর মতো একজন নেত্রীকে হত্যা করার যে-চেষ্টা হয়েছে তার পেছনে অবশ্যই একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে। তবে সামনাসামনি যারা এ-ঘটনা ঘটিয়েছে তারা কতটা রাজনৈতিক আমি জানি না। তারা ভাড়াটেও হতে পারে। কিন্তু যারা এসব ঘটনার পেছনে কলকাঠি নাড়ে তারা খুব সম্ভব রাজনৈতিক।

**প্রথম আলো** *বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ের মতো প্রকাশ্য জায়গায় বিকেলবেলা হামলাকারীরা ১৫-১৬টি গ্রেনেড ছুঁড়েছে, শেখ হাসিনার গাড়ি লক্ষ্য করে গুলিও করেছে এবং এসব করে তারা নির্বিঘ্নে পালিয়ে গেছে। একজনও ধরা পড়ে নি। এটা কী করে সম্ভব?*

**জেনারেল মইন** এটা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর গুরুতর ব্যর্থতা। দিনেদুপুরে ১২-১৩টা গ্রেনেড নিয়ে এসে নিক্ষেপ করে নির্বিঘ্নে চলে যাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। এই গ্রেনেড হামলা করতে তাদের অন্তত ১০ থেকে ১২ মিনিট সময় লেগেছে। আপনি যে-প্রশ্ন করলেন সেটা আমারও প্রশ্ন। এই যে ১০-১২ মিনিট ধরে তারা গ্রেনেডগুলো নিক্ষেপ করল, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কারও নজরেই এল না—এটা আমাকে অবাক করে। ঘটনাস্থলে ও এর আশপাশে পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার কয়েকশ সদস্য ছিল। আর আমাদের দেশে বিরোধীদলের রাজনৈতিক অফিস সাধারণত গোয়েন্দা সংস্থা ইত্যাদির নজরদারির মধ্যে থাকে। তারা কী করছিল? তাদের দায়িত্ব কী? এগুলো আমারও জিজ্ঞাসা। এ থেকে বোঝা যায়, আমাদের আইন প্রয়োগকারী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কাজের ধরন কী। তাদের লক্ষ্য ক্ষমতাসীনদের দ্বারা রাজনৈতিকভাবে নির্ধারণ করা। ফলে দেশ ও জাতির নিরাপত্তার মূল বিষয়ে তারা দৃশ্যত মনোযোগহীন।

**প্রথম আলো :** *শুধু পুলিশের*

**জেনারেল মন :** আর শুনুন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর অদক্ষতার কথা বলতে গেলে আবারও রাজনীতির কথা বলতে হয়। এদের নিয়োগ, পদায়ন, পদোন্নতি ইত্যাদি সবকিছুর রাজনৈতিকীকরণ করা হয়েছে। সততা ও পেশাদারিত্বের মর্যাদা দেয়া হয় না। পুলিশের অদক্ষতার দোষ কিন্তু শুধু পুলিশকে দিলেই চলবে না, যাঁরা সরকার পরিচালনা করেন তাঁরাও এর জন্য দায়ী। এদেশে আপনি যদি ভালো পেশাদার হন আর দুর্নীতিবাজ না হন, তা হলে আপনার সমস্যা হবে। আপনি সৎ ও পেশাদার লোক হলে আপনার দাম নেই। সরকার যাঁরা পরিচালনা করেন, তাঁরা দেখেন আপনি তাদের আত্মীয় কি না, আপনি তাঁদের পদলেহন করতে পারবেন বা করছেন কি না। সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা এখানে, সবকিছু অ্যাডহক ভিত্তিতে চালানো হয়, এমনকি প্রশাসন ও গোয়েন্দা সংস্থাও। এসব কারণে আমার মনে হয়, তদন্ত কমিটি, এত বক্তৃতা-বিবৃতি-সভা-সেমিনারে কী সমাধান হবে আমি জানি না।

**প্রথম আলো** *একজন বিচারপতির নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কিন্তু এটা তো খুবই টেকনিক্যাল একটা বিষয়*

**জেনারেল মইন** কোনোকিছু ঘটলেই বলা হয়, নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় তদন্ত করতে হবে। এর মানে হচ্ছে সরকারের ওপর আমাদের আস্থা নেই। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলে বিএনপি আওয়ামী লীগকে দোষারোপ করে। আর বিএনপি ক্ষমতায় থাকলে আওয়ামী লীগ বিএনপিকে দোষারোপ করে। আর যারা এসব ভয়াবহ অপরাধ করে যাচ্ছে তারা থেকে যাচ্ছে ধরাছোঁয়ার বাইরে। তারা দেখছে ওরা পরস্পরকে দোষারোপ করা নিয়ে আছে, আর তারা তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এভাবে তারা উৎসাহিত হচ্ছে। কিন্তু এরা কারা? কারা এসব ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ একের পর এক ঘটিয়ে যাচ্ছে? নাগরিক হিসেবে এটা কি আমরা কোনোদিন জানতে পারব?

**প্রথম আলো** *আওয়ামী লীগ আন্তর্জাতিক তদন্ত দাবি করেছে, সরকার শেষ পর্যন্ত ইন্টারপোলের সাহায্য চেয়েছে। নিজেদের আন্তরিকতা না থাকলে এভাবে কি কিছু উদ্ঘাটিত হতে পারে?*

**জেনারেল মইন** এ-ধরনের তদন্তের কাজে টেকনিক্যাল সহযোগিতার জন্য বিদেশী বিশেষজ্ঞ দরকার হলে নিয়ে আসা হোক, তাতে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু এই যে কথায় কথায় বলা হয় আন্তর্জাতিক আন্তর্জাতিক, আমার কিন্তু এই মানসিকতার ব্যাপারে সায় নেই। ব্যক্তিগতভাবে এটা আমার আত্মসম্মানে লাগে। কারণ এই আত্মসম্মানের জন্যই তো যুদ্ধ করেছি। মৃত্যুর ভয়ে নয়, পাকিস্তানের নিচে সারাজীবন হামাগুড়ি দিয়ে চলতে হবে—এই আশঙ্কায় যুদ্ধ করেছি। আমি চাই জাতির কাছে গ্রহণযোগ্য একটা নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করা হোক। দেখুন, সিলেটে ব্রিটিশ হাইকমিশনারের ওপর গ্রেনেড হামলার তদন্তের জন্য

ব্রিটিশ গোয়েন্দারা এসেছিল। কিন্তু সেটার কী হলো? তারা কী রিপোর্ট দিল, জনগণ তো কিছুই জানতে পারল না। আন্তর্জাতিক তদন্তের দরকার হতো না, যদি আমরা নিজেরাই সৎ ও আন্তরিকভাবে এসব সমস্যার সমাধান করতে চাইতাম।

দেখুন, আমরা যদি নিজেদের সমস্যা নিজেরা সমাধান করতে না পারি তা হলে আমরা একটা স্বাধীন-সার্বভৌম জাতি বা রাষ্ট্র কী করে হই? আমাদের অভ্যন্তরীণ অঙ্গীকার কতটুকু আছে সেটা আগে দেখতে হবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে আমাদের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব নিয়েও শঙ্কিত। আমরা যদি একমত হই যে, আমাদের দেশ, জাতি ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে এবং সেই লক্ষ্যে এসব সন্ত্রাসী তৎপরতা নির্মূল করা অত্যন্ত জরুরি, তা হলে কিন্তু অনেক কিছুই করা সম্ভব। আমি আসল সমস্যা দেখি রাজনীতির ধরনের মধ্যে। এখানেই দেশের জন্য আমাদের সততা ও আন্তরিকতার অভাব। ক্ষমতার রাজনীতিকে দেশের ওপর স্থান দেয়া হচ্ছে।

**প্রথম আলো** *ধরা যাক সরকার সিদ্ধান্ত নিল যে, বোমা হামলার ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত করে অপরাধীদের বিচার করবে। সেক্ষেত্রে কি আইন প্রয়োগকারী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর দক্ষতা, যোগ্যতা ও শক্তি-সামর্থ্য যথেষ্ট মনে করেন?*

**জেনারেল মইন** আধা ডজন গোয়েন্দা সংস্থা আছে আমাদের দেশে। তবে এগুলোর মধ্যে কোনোরকম সমন্বয় নেই। একেক সংস্থা একেক কথা বলে যাচ্ছে বিভিন্ন সময়ে। নানা সমস্যা আছে এগুলোর মধ্যে। ধরুন, আমাকে কারও পছন্দ হয় না, সে বলবে, জেনারেল মইন মৌলবাদী কিংবা বিএনপি, নয়তো আওয়ামী লীগার। আমি চাকরিতে থাকতে দেখেছি, গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর মধ্যে 'অটো সাজেশন' দেয়ার প্রবণতা প্রবল। দু রকম ব্যাপার আছে। একটা হলো, আপনি সরকারপ্রধান, আপনি যেটা শুনতে চান, যা শুনলে আপনি খুশি হবেন আমি আপনাকে তা-ই বলব। ধরুন, আপনি শুনতে চান যে দেশে জঙ্গিবাদী তৎপরতা নেই। আমি গিয়ে আপনাকে বলব, জঙ্গি বলে দেশে কিছু নেই। থাকলেও বলব, নেই। আরেকটা হলো, আমি মনে করি যে, এই লোকটার পদোন্নতি আমি চাই বা এই লোকটার মন্ত্রী হওয়া উচিত বা এই লোকটাকে জেলে ঢোকানো উচিত। তখন আমি সেভাবে তথ্য বানিয়ে-সাজিয়ে জানাব। এগুলো যাচাই-বাছাই করার কোনো ব্যবস্থা বা পদ্ধতি সরকারের আছে বলে জানা নেই। আমাদের সরকারের একজন সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার পর্যন্ত নেই। সব দেশেই ন্যাশনাল থ্রেট অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার আছে। আমাদের তাও নেই। গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে ঢেলে সাজাতে হবে, তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে তাদের ব্যবহার করা বন্ধ করতে হবে। তাদের দেশের স্বার্থে কাজে লাগাতে হবে—এর কোনো বিকল্প নেই।

**প্রথম আলো** *গ্রেনেড হামলার পর বিশ্বের নেতৃবৃন্দ বেশ উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এ-ঘটনার আন্তর্জাতিক প্রভাব কেমন হবে বলে আপনার মনে হয়?*

**জেনারেল মইন :** দুর্নীতি ও সন্ত্রাস আমাদের ভাবমূর্তি দিনদিন রসাতলে নিয়ে যাচ্ছে। এ ঘটনা দেশের ভাবমূর্তির আরও ক্ষতি করবে। আমি ১৬ বছর রাষ্ট্রদূত হিসেবে দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছি। আমাদের ভাবমূর্তি কখনই খুব একটা ভালো ছিল না। তার ওপর এরকম ঘটনা ঘটলে দেশের ভাবমূর্তির আরও ক্ষতি হয়। দেখুন, কিছুদিন আগেই একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ গেল। বন্যার কথা বলছি। সেই দুর্যোগ শেষ না-হতেই আবার একটা মানব-সৃষ্ট দুর্যোগ এসে গেল। বিরোধীদলীয় নেত্রীর ওপর গ্রেনেড হামলার ঘটনাকে আমি দেশের জন্য একটা মানব-সৃষ্ট দুর্যোগ হিসেবে দেখি, যেটার জন্য বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বাংলাদেশে এখনও ৭৭ শতাংশ মানুষ দৈনিক ১২০ টাকার কম উপার্জন করে। এরকম দারিদ্র্যের মধ্যে যদি আবার এ-ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চলতে থাকে, তা হলে দেশের উন্নতি কী করে হবে? আর বহির্বিশ্বে আমাদের ভাবমূর্তিই-বা কীভাবে ভালো থাকবে?

**প্রথম আলো :** *এসব সন্ত্রাসী তৎপরতার সঙ্গে কি ইসলামি জঙ্গিবাদ..বা মৌলবাদের কোনো সম্পর্ক আছে?*

**জেনারেল মইন** যদি জঙ্গিবাদী তৎপরতার বিরুদ্ধে সরকারের কোনো পদক্ষেপ না দেখা যায় তা হলে জনগণের ধারণা হয় যে, এদের পেছনে সরকারের একটা প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় আছে। জনগণ মনে করে সরকার এদের উৎসাহিত করছে। যারা প্রকাশ্যে নিজেদের জঙ্গিবাদী বলে প্রচার করে এমন সংগঠন নিষিদ্ধ করতে হবে। তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নিলে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়। সরকার যদি এদের বিরুদ্ধে শক্ত পদক্ষেপ নেয় তা হলে জনগণ বুঝতে পারবে যে, সরকারের এদের সঙ্গে কোনো সম্পৃক্ততা নেই।

**প্রথম আলো** *এভাবে চলতে থাকলে এবং সরকার কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে দেশের অবস্থা কী দাঁড়াবে?*

**জেনালের মইন** দেশের গণতন্ত্রই বিপন্ন হবে। গত ১৩-১৪ বছরে আমরা গণতন্ত্রের যেটুকু পর্যায়ে পৌঁছেছি, সেটাও বিপন্ন হবে। নৈরাজ্য হবে। আমি বলব না যে, বাংলাদেশের অস্তিত্ব থাকবে না। কিন্তু অরাজকতা হবে, দেশ পিছিয়ে যাবে। দারিদ্র্য বাড়বে, অশান্তি বাড়বে। আমরা একটা সংকট থেকে আরেকটা সংকটে ঘুরপাক খেতে খেতে পিছিয়ে যেতে থাকব।

**প্রথম আলো :** *বোমা ও গ্রেনেড হামলাসহ সব সন্ত্রাসী তৎপরতা রোধের জন্য আপনার পরামর্শ কী?*

**জেনারেল মইন** সরকারকে আন্তরিকতার সঙ্গে জোরালো পদক্ষেপ নিতে হবে। সশস্ত্র জঙ্গিবাদী সংগঠনগুলোকে নিষিদ্ধ করতে হবে, তাদের কারাগারে নিক্ষেপ করতে হবে। কারণ এসব কর্মকাণ্ড দেশের আইনের পরিপন্থি, সংবিধানের পরিপন্থি। দ্বিতীয়ত, এ-পর্যন্ত যতগুলো বোমা ও গ্রেনেড-হামলার ঘটনা ঘটেছে সবগুলোর রহস্য উদ্ঘাটন করে বিস্তারিত তথ্য জনগণকে জানাতে হবে। কী জানা

গেছে, কী জানা যায় নি, বিচার করা সম্ভব হয়েছে কি হয় নি, না হলে কেন হয় না—ইত্যাদি সবকিছু জনগণকে জানাতে হবে। তৃতীয়ত, সন্ত্রাস দমনের ব্যাপার নিয়ে রাজনীতি করা চলবে না, দুর্নীতি হতে দেয়া যাবে না। চতুর্থত, গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে ঢেলে সাজাতে হবে, তাদের কাজের সমন্বয় সাধন করতে হবে, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে চালাতে হবে সম্পূর্ণ পেশাদারি ভিত্তিতে, সরকারের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে নয়, কারও হাত মোচড়ানোর হাতিয়ার হিসেবে নয়। পুরো আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীতে লোক নিয়োগে, পদায়নে, পদোন্নতিতে রাজনৈতিক বিবেচনা ত্যাগ করে সততা, দেশপ্রেম, মেধা, দক্ষতা ও যোগ্যতার নীতি মেনে চলতে হবে।

**প্রশ্ন** *আপনি দীর্ঘদিন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল ছিলেন। তখন অনেকগুলো ঘটনার তদন্ত ও কোর্টমার্শাল হয়েছিল আপনার তত্ত্বাবধানে। ২১ আগস্টের ঘটনা কীভাবে তদন্ত হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?*

**জেনারেল মইন :** প্রথমত, যারা বিরোধীদলীয় নেত্রীকে হত্যা করতে চেয়েছে তারা কারা? তাদের পরিচয় কী? এদের চিহ্নিত করা খুব জরুরি। এটা তদন্তের মূল বিষয়। দ্বিতীয়ত, কীভাবে তারা শেখ হাসিনার এত কাছাকাছি যেতে পারল, এবং গ্রেনেড নিক্ষেপ করতে সক্ষম হলো? একজন উচ্চমানের প্রশিক্ষিত লোকও ৩০ মিটারের বেশি দূরে গ্রেনেড নিক্ষেপ করতে পারে না। তৃতীয়ত, সরকারিভাবে কারা ওই সময় শেখ হাসিনার নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিল তা চিহ্নিত করতে হবে। চতুর্থত, কীভাবে ও কোথা থেকে সন্ত্রাসীদের কাছে এই গ্রেনেড এল। জানা গেছে, এটা অস্ট্রিয়ার তৈরি গ্রেনেড, অন্য কটি দেশও অস্ট্রিয়ার অনুমোদনে এ ধরনের গ্রেনেড তৈরি করে থাকে। পঞ্চমত, হামলার সময় শেখ হাসিনার নিরাপত্তায় নিয়োজিত লোকদের প্রতিক্রিয়া কী ছিল? তাঁরা কে কী করেছিলেন বা তাৎক্ষণিকভাবে কী অ্যাকশন নিয়েছিলেন? যষ্ঠত, শেখ হাসিনার সমাবেশ শুরুর আগে তাঁদেরর প্রস্তুতি কী ছিল, সমাবেশের সময়, গ্রেনেড নিক্ষেপের মুহূর্তে এবং ঘটনার পরে তাঁরা কী করেছিলেন? সবশেষে ঘটনা ঘটার পর সরকার কী কী পদক্ষেপ নিয়েছে? বিশেষ করে বিরোধীদলীয় নেত্রী, যাঁকে আমি মনে করি ছায়া প্রধানমন্ত্রী, তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টার পর সরকার কী করেছে বা ভবিষ্যতে কী করতে যাচ্ছে—সেটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ।

*প্রথম আলো* ২৯ আগস্ট ২০০৪

# জেহাদিদের জঙ্গের ঢং

বাংলাদেশে জঙ্গিদের বোমাবাজি এবং এর কলাকৌশল নিয়ে পেশাদার সৈনিক হিসেবে মনে কৌতূহল ও চিন্তা জাগাটা স্বাভাবিক। যদিও এর পুরোটাই ১৭ আগস্টের বোমা হামলা নিয়ে, যদিও এরপর আরও কয়েকটি হামলার ঘটনা ঘটেছে এবং সেসব হামলার লক্ষ্য ছিল বিশেষ করে বিচারালয় ও বিচারক। সর্বশেষ ঝালকাঠিতে বিচারকদের বহনকারী গাড়িতে বোমা হামলা হয়েছে এবং দুজন বিচারক মারা গেছেন। কথা হচ্ছে, জঙ্গিরা এই লক্ষ্যগুলোকে বেছে নিল কেন?

বিচারক ও তাঁদের কর্মস্থল, সভা-সমিতি, জনবহুল এলাকা, যেমন সিনেমা হল, মার্কেট এসব হলো সহজ লক্ষ্য (সফট টার্গেট)। আমার কৌতূহলের কারণ, এই সফট টার্গেট তথা অসহায়-নিরীহ মানুষের ওপর হিংস্রতা কেন? এটা তো কাপুরুষতা ও বিবেকবর্জিত কার্যকলাপ! ইসলাম তো বটেই, অন্য যে-কোনো ধর্মেই এটা গুরুতর পাপ বলেই বিবেচিত হয়।

যদি তথাকথিত জেহাদি জঙ্গিদের উদ্দেশ্য থাকে বোমা ফাটিয়ে ভয়-ভীতি দেখানো এবং কিছু নিরীহ লোককে হত্যা করে তথাকথিত ইসলামি আইন কায়েম করা, তা হলে বুঝতে হবে তারা রাষ্ট্র পরিচালনা ও ক্ষমতা-দখলের কলাকৌশল সম্পর্কে কিছুই জানে না। এসব কি তাদের নিগূঢ় অজ্ঞতা অথবা সচেতন নির্বুদ্ধিতা? নাকি এটি তাদের সমাজবিরোধী হিংস্র রুগ্ণ মানসিকতার পরিচয়?

জঙ্গিরা যদি মনে করে থাকে কয়েকশ বোমা ফাটিয়ে, নিরীহ লোককে হত্যা, জনগণকে ভয়-ভীতি দেখিয়ে ক্ষমতা দখল করবে এবং দেশে তালিবানি উগ্রপন্থি শাসনব্যবস্থা কায়েম করবে, তা হলে বলতে হয় তারা বিকৃতমস্তিষ্ক এবং ক্ষমতা-দখলের যুদ্ধের কলাকৌশল সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। আর কয়েকটা পুস্তিকা পড়ে এবং কয়েকদিন বিদেশী জঙ্গিদের সঙ্গে মিলেমিশে যুদ্ধ ও রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের কলাকৌশল শিখে ফেলেছেন বলে যদি তাঁদের বিশ্বাস জন্মে থাকে তবে সেটাও হবে তাঁদের নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। জঙ্গি 'আলেম'দের বলি, "এক মণ সামরিক ইলেম নয়, মণ আক্কেল প্রয়োজন"।

একটি রাষ্ট্র যতই দুর্বল ও অদক্ষ লোক দ্বারা পরিচালিত হোক না কেন, শুধু সন্ত্রাসী ও নাশকতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করা সম্ভব নয়। আমাদের দেশে নিষিদ্ধ ঘোষিত গুপ্ত রাজনৈতিক দল ও পার্শ্ববর্তী দেশে নকশালপন্থিরা দৃঢ়ভাবে রাজনৈতিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ ও বলীয়ান হয়েও শুধু বোমা ও চোরাগোপ্তা হামলা চালিয়ে ক্ষমতার ধারেকাছেও যেতে পারে নি।

যুগ যুগ ধরে ক্ষমতা-দখলের প্রতিষ্ঠিত পন্থা হলো ১. গণতান্ত্রিক উপায়ে ভোটের মাধ্যমে জনগণের আস্থা অর্জন, ২. স্বাধীনতা যুদ্ধ, ৩. গণঅভ্যুত্থান, ৪. সামরিক অভ্যুত্থান, ৫. গৃহযুদ্ধ, ৬. বহিঃশক্তির মাধ্যমে ক্ষমতা দখল; যেমনটা হয়েছে ইরাক ও আফগানিস্তানে। এ ছাড়া আর-কোনো উপায়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের নজির ইতিহাসে আছে বলে মনে হয় না।

দেশের ৬৩ জেলায় বিচ্ছিন্নভাবে কতগুলো বোমা ফাটানো এবং লিফলেট ছড়ানোর উদ্দেশ্য সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে অযৌক্তিক। যদি ক্ষমতা দখল কিংবা মোল্লাতন্ত্র চাপিয়ে দেয়াই তাদের মূল উদ্দেশ্য হয় তা হলে বলতে হয় তারা মূর্খ অথবা তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন? যুদ্ধে অপরিকল্পিতভাবে মাইন এখানে-সেখানে পুঁতে রাখাকে সামরিক বাহিনীতে বলা হয় 'নুইসেন্স মাইনফিল্ড', যার বাংলা দাঁড়ায় বিরক্তিকর মাইনফিল্ড। জঙ্গিদের ৬৩ জেলায় বোমা হামলার ঘটনাও সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে একপ্রকার 'নুইসেন্স বোমবিং'-এর পর্যায়ে পড়ে।

পদাতিক সৈনিক (ইনফেনট্রি) হিসেবে আমার বেশির ভাগ সময় কেটেছে গোলাগুলির শব্দ, বারুদের গন্ধ ও যুদ্ধের কলাকৌশল নিয়ে। যদিও নিজেকে বিশেষজ্ঞ মনে করি না, তবু বিশেষ করে ষাটের দশকে কাশ্মীরে দুই বছর এবং '৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের ফলে কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে। সে-অভিজ্ঞতা আর সামরিক বিষয়ে লেখাপড়া থেকে বলতে পারি, সামরিক বাহিনীতে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ হলো সরাসরি 'অরগানাইজড ভায়োলেন্স' শেখানো। যদিও প্রবাদ আছে, 'সৈনিকরাই সবচেয়ে বেশি শান্তিকামী'।

সামরিক বাহিনীতে সাঁজোয়া ও পদাতিক বাহিনী, যারা যুদ্ধে মূল ভূমিকা পালন করে তাদের বলা হয় 'ফাইটিং আর্মস'। '৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর একটি পদাতিক বাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে আখাউড়া থেকে ঢাকায় পৌঁছি। তখন থেকেই যুদ্ধ-পরবর্তী দেশের আইন-শৃঙ্খলা, বিশেষ করে অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার এবং সন্ত্রাসী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রায় তিন বছর তৎকালীন ঢাকা বিভাগে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলাম একটি ব্যাটালিয়ন ও ব্রিগেডের অধিনায়ক হিসেবে।

১৯৯৯ সাল থেকে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, রাজনৈতিক সভা এবং ব্যক্তিবিশেষের ওপর অনেক বোমা হামলা হয়েছে; নিহত হয়েছেন অনেক মানুষ। কিন্তু ১৭ আগস্টে ৬৩ জেলার বোমা হামলা ছিল অন্য সব বোমা হামলার চেয়ে ভিন্নতর। এর কৌশলও ছিল ভিন্ন। এর জন্য দায়ী করা হচ্ছে ইসলামি মৌলবাদীদের।

আমাদের পত্রপত্রিকায় 'মৌলবাদী' বলতে ইসলামি উগ্রবাদীদের বোঝানো হয়। এসব উগ্রবাদীর রাজনৈতিক মতবাদ হলো, ১৪০০ বছরের পুরনো মোল্লাতান্ত্রিক ধ্যানধারণা। তারা চায় দেশকে হাজার বছর পেছনে নিয়ে মধ্যযুগীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করতে, যেখানে থাকবে না আধুনিক সামাজিক ব্যবস্থা, নারীস্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও বিজ্ঞান প্রযুক্তির কোনো ইতিবাচক প্রভাব এবং অতি অবশ্যই মানবাধিকার। উদাহরণস্বরূপ, আফগানিস্তানে তালেবান শাসিত ক্ষণস্থায়ী সরকার।

'মৌলবাদ' শব্দটি পশ্চিমাদের দৃষ্টিতে অপবাদসূচক। মুসলমানদের ওপর ঢালাওভাবে তা চাপিয়ে দেয়ার প্রবণতাও লক্ষ করা যায়। এমনকি পশ্চিমা ও অন্যকিছু দেশের প্রচারমাধ্যমে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতা, যোদ্ধাসহ অন্য মুসলিম স্বাধীনতা যোদ্ধাদেরও 'মৌলবাদী' বলা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের জেহাদি জঙ্গিরা তাদের মৌলবাদী বললে দৃশ্যত খুশি হয়। তাদের কাছে মৌলবাদের একটি স্বপক্ষীয় ও নিজের পছন্দমতো ব্যাখ্যা আছে।

যেসব লোককে বোমা হামলায় ব্যবহার করা হয়েছে তাদের কাছেও হয়তো এ-হামলার উদ্দেশ্য স্পষ্ট ছিল না। তারা দারিদ্র্যের কারণে ভাড়াটিয়া বাহক হিসেবে সমাজ ও দেশবিরোধী এই কাজে প্ররোচিত, প্রতারিত অথবা বিপথগামী হয়েছে। যদিও মূল পরিকল্পনাকারী ও মদদদাতারা এখন পর্যন্ত আড়ালেই থেকে গেছে। ফলে তাদের পরিকল্পনার উদ্দেশ্য এখনও অস্পষ্ট। এটা কি তারা করেছে নিজের আয় ও আর্থিক স্বার্থে, নাকি জনগণকে আতঙ্কিত করে দেশকে অস্থিতিশীল করতে? নাকি এর পেছনে কোনো সুনির্দিষ্ট ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা আছে?

যেসব জঙ্গি এ-পর্যন্ত গ্রেপ্তার হয়েছে, টেলিভিশনে তাদের চেহারা, আচার-আচরণ, কথাবার্তা ও জীবনবৃত্তান্ত পত্রপত্রিকায় যা পড়েছি, তা থেকে আমার মনে হয় নি যে, তারা কোনো সুনির্দিষ্ট ধর্মীয় বা রাজনৈতিক আদর্শে বলীয়ান হয়ে এগুলো করেছে। পদাতিক বাহিনীর অফিসার ও মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমি জানি, যুদ্ধ কিংবা যুদ্ধ-সম্পৃক্ত কাজে একজন সৈনিকের কতটুকু অনুপ্রেরণা, বিবেকের স্ফুলিঙ্গ, মনোবল ও আত্মত্যাগী মানসিকতার প্রয়োজন। ন্যায়ের যুদ্ধে কোনো ত্যাগই যথেষ্ট নয়। তাই সৈনিকরা মনে করেন, পরাজয়ের চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়।

কিন্তু এরা কোন আদর্শে দীক্ষিত হয়ে দেশ ও জনস্বার্থবিরোধী এসব কাজে প্ররোচিত হলো, বিপথগামী হলো? বোমাবাজির ঘটনায় জড়িত সন্দেহে এখন পর্যন্ত যারা গ্রেপ্তার হয়েছে, তাদের বেশির ভাগই বেকার, অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত হতদরিদ্র পরিবারের সদস্য। আমি মনে করি, জঙ্গিদের এসব অপতৎপরতার সঙ্গে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং কোনোভাবেই এ ঘটনাগুলো আলাদাভাবে দেখে সঠিক ধারণা পাওয়া যাবে না। দেশের সার্বিক অবস্থার প্রতিফলন ঘটে চলমান রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক স্থিতিশীলতার ওপর।

কিন্তু আমাদের দেশের রুগ্‌ণ রাজনীতি, দুর্নীতি ও দুর্নীতিক্লান্ত (!) প্রশাসনই বর্তমান দেশকে এই পরিস্থিতিতে নিয়ে এসেছে।

দেশে এখন সুনির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক মতবাদ ও আদর্শ ছাড়াই কিছু বিত্তশালী ব্যবসায়ী, অবৈধ অর্থ উপার্জনকারী ও সাবেক সরকারি কর্মকর্তাদের হঠাৎ করে রাজনীতিতে জড়িত হওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এই তথাকথিত 'দেশসেবা'র পেছনে খুব সম্ভব দুটি কারণ থাকতে পারে। এক. তাঁরা রাজনীতি ও ব্যবসাকে পরস্পরের সমার্থক ভাবেন। এটি হলো তাঁদের চটজলদি আরও টাকা-পয়সা কামানোর আরেকটি সহজ পথ।

দ্বিতীয় দলে যাঁরা আছেন তাঁরা লুটপাট ও অবৈধভাবে অর্জিত ধনসম্পদ রক্ষা ও সামাজিক মর্যাদালাভের আশায় রাজনীতির সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত করেন। এভাবে রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন এবং দুর্বৃত্তায়নের রাজনীতির কারণেই দেশ থেকে সন্ত্রাস, দুর্নীতি, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা দূর করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ফলে দেশে সামাজিক, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দিন-দিন বেড়ে চলেছে। আর এই ভারসাম্যহীন আর্থ-সামাজিক অবস্থার সুযোগ নিয়ে উঠতি বয়সের তরুণদের বিপথগামী করে কাউকে 'জোহাদে', কাউকে 'বিপ্লবে' অথবা কাউকে 'দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী' তৈরিতে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। আর এর অনেক কিছুই ঘটছে রাজনীতির ছত্রচ্ছায়ায়।

আমার জানা মতে, দেশে দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ ইত্যাদি কাজে কর্মরত আছে ২২ হাজারেরও বেশি এনজিও। এনজিওদের লাভের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ (Poverty reduction through profit making!) কিংবা সরকার কর্তৃক গৃহীত মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল ও পিআরএসপি বাস্তবায়ন করে দেশের দুস্থ-দরিদ্র মানুষদের ক্ষুধা ও নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে কতটা মুক্ত করা সম্ভব হবে তা অনিশ্চিত। কারণ এখনও দেশে ৩ কোটি মানুষের প্রতিদিনের আয় ৬০ টাকারও কম। আবার শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ লোক নিরক্ষর। দেশে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান গত তিন দশক ধরে যেভাবে বেড়েছে, সেটা আমি-আপনি যেমন জানি, তার চেয়ে বেশি জানেন যাঁরা বিভিন্ন সময় দেশ পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন বা আছেন।

ব্যবসায়ীসহ যাঁরা ক্ষমতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন ও আছেন তাঁদের অনেকে এখন দেশের শীর্ষ ধনীদের অন্তর্ভুক্ত। এটা প্রকাশ পায় তাঁদের জীবনযাত্রার মান, আচার, অনুষ্ঠান এবং ধন-দৌলতের 'অশ্লীল প্রদর্শন' থেকে। শোরুম উদ্বোধনের আগেই কোটি কোটি টাকা দামের ডজন ডজন বিএমডব্লিউ ও মার্সিডিজ বিক্রি হয়ে যাওয়া তারই উদাহরণ কি না আমি তা বলতে পারব না।

দেশে সঠিক নেতৃত্ব, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, সুশাসন, ন্যায়বিচার আর প্রকৃত অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত দেশ এক সমস্যা থেকে আরেক

সংকটে ঘুরপাক খাবে। তার প্রমাণ হচ্ছে, বিগত তিনটি নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও দেশের জনগণ প্রকৃত অর্থে সুশাসন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আর বিপরীতে ধারাবাহিকভাবে সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও জঙ্গি কার্যকলাপের কারণে দেশে এক উচ্ছৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এবং বহির্বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি হচ্ছে ক্রমশ নিম্নগামী।

শুধু গণতন্ত্র ও মানবাধিকার এবং মুক্ত গণমাধ্যম নিয়ে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি হৈচৈ হয়। কিন্তু আমি মনে করি একটি সুস্থ সমাজের জন্য মৌলিক বিষয় হচ্ছে— সন্ত্রাস, খুন, দুর্নীতি, জনগণের হয়রানি, অনিশ্চয়তা এবং ক্ষমতায় যাওয়া ও ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার সংঘাত বন্ধ করা, যে-সংঘাতে এখন দেশের জনগণ জিম্মি হয়ে পড়েছে।

মজার বিষয় হলো, যাঁরা বিভিন্ন সময়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সন্ত্রাস, কুশাসন ও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত, তাঁরাই আবার এই বিষয় নিয়ে নির্লজ্জভাবে জনগণের সামনে সভা, সমিতি ও সেমিনারে বক্তব্য রাখেন। এটা শুধু বাংলাদেশেই সম্ভব! সুট-কোট ও ধবধবে কোর্তা-পাজামা পরিহিত মুখভরা দেশপ্রেমের বুলি আওড়ানো বিবেকহীন কিছু রাজনীতিক ও অর্থনৈতিক সন্ত্রসীদের হাতেই দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আটকে পড়েছে।

আমার মতে, রাজনীতির মুখোশ-পরা কিছুসংখ্যক ভদ্রবেশী রাজনীতিক ও অর্থনৈতিক সন্ত্রাসীদের কারণে দেশের সর্বক্ষেত্রে অস্থিরতা ও অরাজকতা দিন-দিন অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির বড় কারণ হলো এসব ভদ্রবেশী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সন্ত্রাসী। আর এরাই অনেক ক্ষেত্রে ছলে-বলে-কৌশলে দেশের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। দেশ পরিচালনায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সন্ত্রাসী কার্যকলাপের ফলে দেশে বিরাজ করছে সুশাসনের বিরাট অভাব। আর এভাবেই রাজনীতি ও ধর্মের মুখোশে যে-দুর্নীতি ও সন্ত্রাস চলে তারই অপর নাম হচ্ছে 'জেহাদি জঙ্গিবাদ', 'চরমপন্থা' কিংবা রাজনৈতিক সন্ত্রাস'। এগুলোই একটি আরেকটির সঙ্গে সম্পৃক্ত ও পরিপূরক, যার সম্মিলিত দুষ্টচক্রে বন্দি একাত্তরের স্বপ্নের বাংলাদেশ।

*প্রথম আলো* ২১ নভেম্বর ২০০৫

# এ কেমন দৈন্য

গত বছরের ১৫ ডিসেম্বর লিখেছিলাম, ‘দেশটা কেমন করে এমন হলো’। তাতে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে চলমান বাংলাদেশের সামগ্রিক অবস্থা নিয়ে বলেছিলাম। বলেছিলাম শাসনব্যবস্থা, অর্থনীতি, রাজনীতি এবং জনগণের ওপর তার প্রভাব নিয়ে। এক বছর পর আবার এই ডিসেম্বরে, নির্দিষ্ট করে বললে এবারের বিজয় দিবসে ঢাকা শহরের একটি বিষয় আমাদের দারুণভাবে নাড়া দেয়ায় বিবেকের তাড়নায় লেখার তাগিদ অনুভব করেছি। কারণ আমাদের বিবেকের স্ফুলিঙ্গ এখনও নেভে নি।

১৬ ডিসেম্বর সকালে নগরভবনে ঢাকার মেয়রের আমন্ত্রণে মুক্তিযোদ্ধাদের এক সমাবেশে যাচ্ছিলাম। আমার সঙ্গে ছিলেন আরেকজন মুক্তিযোদ্ধা। তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধে আমার সঙ্গী ছিলেন, যাঁর বয়সও ৬০ পেরিয়ে গেছে। তিনি আমার বাসার সামনে নেমে বললেন, স্যার আপনাদের গুলশানের আবাসিক বাড়িগুলোতে তো নেই-ই, আমাদের মোহাম্মদপুরেও কোনো বাড়ির ছাদে বা সামনে জাতীয় পতাকা চোখে পড়ল না। আমি তৎক্ষণাৎ চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম, সত্যিই তো! কোনো বাড়িতে বিজয়ের এই দিনে জাতীয় পতাকা দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ আমি চমকে উঠলাম এবং একটা অস্বস্তি আমাকে আঁকড়ে ধরল। মনে পড়ে গেল আমাদের শৈশব ও তরুণ বয়সের কথা। তখন ১৪ আগস্ট কাকডাকা ভোরে সিলেটে আমাদের বাড়িতে আমরা পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসে পতাকা ওঠাতাম। দেখতাম, সব বাড়ি-বাড়ি ছেলে-বুড়ো মিলে পতাকা তুলতো, অনেকে বাড়ির সামনে গেটও বানাতো। আগের রাত থেকে চলত পতাকা তৈরি আর বাঁশ ধোয়ামোছার কাজ। প্রসঙ্গ তুললে তিনিও আমার সঙ্গে সায় দিলেন এবং আরও যোগ করলেন, পতাকার আকার নিয়ে একধরনের প্রতিযোগিতা চলতো—কে কত বড় পতাকা ওড়াতে পারে। গ্রামেগঞ্জে, হাটবাজারে, দোকানপাটে থাকত পতাকার ছড়াছড়ি। মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বাধীনতা দিবসে পতাকা ওড়াত, কোনো আইনি বাধ্যবাধকতার জন্য নয়। মনটা খারাপ হয়ে গেল। নগর ভবনের অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেয়ার কথা থাকলেও না-দিয়েই ফেরত চলে আসি।

সেদিনই বিকেলে আমার বাসায় এক বন্ধু এলেন বেড়াতে। কাকতালীয়ভাবে তিনিও প্রসঙ্গটি তুললেন। কারণ, তাঁর মা অনেক বছর পর আমেরিকা থেকে এসেছেন, যাঁর বয়স ৭৫ পেরিয়ে গেছে। তিনি তাঁর ছেলেকে সকালে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কী, তোমরা আজ পতাকা ওঠাবে না বাসায়?' তিনি জবাব দিলেন, 'কই আশপাশে তো কেউ ওঠাল না।' তিনিও ছেলেকে পাকিস্তানের সময় জাতীয় দিবসে পতাকা ওড়ানোর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, 'নিজেদের বিজয়দিবসেও তোমরা বাড়িতে পতাকা লাগাবে না!'

পাকিস্তান স্বাধীন হয়েছিল টেবিলে বসে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে, শান্তিপূর্ণভাবে। আর আমাদের স্বাধীনতা কীভাবে এসেছে, তা সবার জানা। নিয়তির একি নির্মম পরিহাস! বাংলাদেশের পতাকা ওড়াতে বিজয় দিবসেও আমরা উদাসীন। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট দ্য গল, যিনি তাঁর জাতীয়তাবোধের জন্য বিখ্যাত, তিনি একবার বলেছিলেন, 'ঘৃণা উদাসীনতার চেয়ে ভালো'। আমরা কি জাতীয় পতাকাকে ঘৃণা করি, না আমরা এ-ব্যাপারে উদাসীন? বাঙালি জাতির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন স্বাধীন বাংলাদেশ এবং এর লাল-সবুজ পতাকা। এ নিয়ে আমরা গর্ব বোধ করতে পারছি না কেন? এর জবাব কে দেবে? আমি, না যারা ৩৩ বছর এদেশ পরিচালনা করছেন তাঁরা? আজকে দেশের জনগণ, বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের এ-মনোভাব কেন? আমাদের নেতা-নেত্রী ও স্বাধীনতার তথাকথিত চেতনাধারী বুদ্ধিজীবীরা, যাঁরা এখন নানা আনুষ্ঠানিকতা আর আড়ম্বর নিয়ে ব্যস্ত, তাঁরা কি এ-ব্যাপারে ওয়াকিবহাল!

একটা দেশের জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীত জাতির দেশপ্রেম ও গৌরবের প্রতীক। পতাকা ও জাতীয় সংগীতের অবমাননা করা বা অসম্মান করা যেমন দেশদ্রোহিতার পর্যায়ে পড়ে, তেমনি এর প্রতি উদাসীনতা মানে দেশের প্রতি ঔদাসীন্য। মানে আমরা আমাদের দেশ নিয়ে গর্ব বোধ করতে পারছি না। যে-পতাকার জন্য আমরা জীবন বাজি রেখেছিলাম, সে-পতাকা কি এখন আমাদের কাছে অস্বস্তিকর কিংবা লজ্জার বিষয়? যুদ্ধের মাঠে পতাকা সমুন্নত রাখতে একের পর এক প্রাণ দেয়ার ঘটনা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। যেকোনো দেশে যুদ্ধের সময় পতাকা ওড়ানো কোনো জাতি ও যোদ্ধাদের বীরত্ব, দেশপ্রেম ও শৌর্যবীর্যের বহিঃপ্রকাশ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং এর পতাকা অবিচ্ছেদ্য, একে আলাদা করা যায় না। এই দেশের জন্য, এই পতাকার জন্য অজানা পথে পাড়ি জমিয়েছিলাম, পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে বিদ্রোহ করে নয়টি মাস সম্মুখযুদ্ধ করেছি। আমার সন্তানরা অন্য কিছু তো দূরের কথা, আমার বাবা-মার ছবি পর্যন্ত দেখতে পারে নি। স্থানান্তরযোগ্য কোনো সম্পত্তি আমার ছিল না স্বাধীনতার পর। সবকিছু জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। ১৬ ডিসেম্বরের পর আমার মাকে নতুন করে জীবন শুরু করতে হয়েছিল। এ-অবস্থায় স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ও অসুস্থ হয়ে তিনিও চলে যান।

কখনো একবারের জন্যও এসবের জন্য অনুতাপ হয় নি। কারণ সম্মান, আত্মতৃপ্তি আত্মমর্যাদা এবং বাঙালি জাতীয়তাবোধ নিয়ে পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে বাঁচার জন্য, সর্বোচ্চ ত্যাগের জন্য সবসময় প্রস্তুত ছিলাম। '৭১ সালে আমরা আমাদের বর্তমানকে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিলাম নতুন প্রজন্মের ভবিষ্যতের জন্য। কিন্তু আজ এসব কী দেখছি জীবনসায়াহ্নে! যে-পতাকার জন্য, যে-নতুন প্রজন্মের জন্য যুদ্ধ করেছি, তারা কি একটা দিনের জন্যও রক্তে কেনা দেশ ও পতাকাকে নিয়ে গর্ব বোধ করতে পারে না? তারা কি এতই বস্তুবাদী ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে গেছে? বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে কি তাদের বিলাসিতার জন্য? আজ যদি দেশ স্বাধীন না হতো, তা হলে তারা কোথায় থাকত? তাদের কজনের বাবা-মা পরাধীন দেশে তাদের এই ভোগ-বিলাসী জীবনের উপকরণ জোগাতে পারতো?

বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবসে সরকার এখানে-সেখানে ফ্ল্যাগ লাগায়, আলোকসজ্জা করে। কিন্তু এসবের সঙ্গে তো লোকজনের সম্পৃক্ততা নেই। শুধু আনুষ্ঠানিকতা, বছর পূর্তি। কোনো আবেগ নেই, সব লোকদেখানো। তার ফল আজকের এই প্রজন্ম, তাদের এই উদাসীনতা।

রাতে বিজয় দিবসে বঙ্গভবনের জাঁকজমকপূর্ণ অভ্যর্থনা থেকে ফিরে এসে আমার অসুস্থ স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করলাম, ভাবলাম ৩৩ বছর পর আমাদের জাতীয় পতাকার আজ এই অবহেলা কেন? কেন এদেশের মানুষ, বিশেষ করে এ-দেশের বর্তমান প্রজন্ম অন্তত বিজয় দিবসেও জাতীয় পতাকা ওড়াতে পারে না? কেন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের অফিসে পতাকা লাগায় না? এ-অবস্থায় একটা দেশ এত দ্রুত কীভাবে এল? কেন আমরা আমাদের দেশ, আমাদের পতাকা নিয়ে গর্ব বোধ করতে ইতস্তত করি?

সবশেষে জাতীয় পতাকা নিয়ে ডেনিয়েল ওয়েবস্টারের একটি কথা দিয়ে শেষ করছি—"লেট ইট রাইজ! লেট ইট রাইজ! টিল ইট মিট দ্য সান ইন হিজ কামিং। লেট দি আর্লিয়েস্ট লাইট অব দ্য মর্নিং গ্লিড ইট, অ্যান্ড দ্য পার্টিং ডে লিঙ্গার অ্যান্ড প্লে অন ইটস সামিট।"

*প্রথম আলো* ২০ ডিসেম্বর ২০০৪

## ‘শৃঙ্খলা বাহিনী’ অযোগ্য কেন?

পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে একটি স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করার জন্য জাতীয় সংসদের চলতি অধিবেশনেই বিল পাশ করা হবে। আশার কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু গত ১০ ফেব্রুয়ারির দৈনিক পত্রিকাগুলোতে এই খবর প্রকাশের আগে আরও একটি খবর প্রকাশিত হয়েছিল। আমার আজকের বক্তব্য সেই খবরকে ঘিরেই।

খবরটি হলো, দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার হওয়ার ক্ষেত্রে মূল বিলে যে-কয়েকটি পেশার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল তার মধ্য থেকে শৃঙ্খলা বাহিনীকে বাদ দেয়া হয়েছে। আর এই সিদ্ধান্তটি নেয়া হয়েছে আইন মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটিতে। উল্লেখ্য, সংসদে উত্থাপিত দুর্নীতি দমন কমিশন বিলটি বর্তমানে এই কমিটিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে।

প্রস্তাবিত দুর্নীতি দমন কমিশন আইন-২০০৩ শিরোনামের বিলটির ৮ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, “আইনে, শিক্ষায়, প্রশাসনে, বিচার বা শৃঙ্খলা বাহিনীতে অন্যূন ২০ (বিশ) বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি কমিশনার হইবার যোগ্য হইবেন।” এই কমিশনে তিনজন কমিশনার করার বিধান রয়েছে প্রস্তাবিত আইনটিতে। পত্রিকায় প্রকাশিত খবর অনুযায়ী আগামী সপ্তাহেই আলোচ্য বিলটি জাতীয় সংসদে পাশ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু সংসদীয় কমিটির বৈঠকে একজন সদস্য প্রস্তাব করেছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের সদস্য অর্থাৎ যেসব পেশা থেকে কমিশনার নিযুক্ত হবেন তার মধ্যে ‘শৃঙ্খলা বাহিনীকে বাদ দেয়া হোক’। পত্রিকায় নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে কমিটিতে প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছেন একজন অভিজ্ঞ সদস্য তথা সাংসদ। কেন তিনি শৃঙ্খলা বাহিনীর ২০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন পেশাদার সেনা-কর্মকর্তাকে দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার হওয়ার অযোগ্য ঘোষণা করতে চাইছেন তার কোনো কারণ কোনো পত্রিকার ওই রিপোর্ট থেকে জানা যায় নি।

গণতন্ত্র হলো কোনো বিষয় নিয়ে মুক্তমনে খোলামেলা আলোচনা, আর স্বৈরতন্ত্র হলো গোপনীয়তা বজায় রেখে কাজ করা। সশস্ত্রবাহিনীকে বাদ দেয়ার

বিষয়টি গোপন করা এবং কারণ না জানানো হলে তা স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাব নিয়ে গণতান্ত্রিক কথা বলার মতোই হবে।

আসলে প্রস্তাবিত বিলটিতে 'শৃঙ্খলা বাহিনী' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে তা পরিষ্কার নয়। তারা কি সামরিক বাহিনী, বাংলাদেশ রাইফেল, পুলিশ ইত্যাদি বাহিনীর সদস্য? নাকি সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীকে বোঝানো হয়েছে? পত্রিকান্তরে 'আর্মড ফোর্সেস' বা সশস্ত্রবাহিনী ব্যবহার করা হয়েছে। তা হলে ধরে নেয়া যায় 'শৃঙ্খলা বাহিনী' বলতে বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী তথা সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর সদস্যদের বোঝানো হয়েছে।

সংসদীয় কমিটিতে সশস্ত্র বাহিনীকে বাদ দেয়ার মতো একটি স্পর্শকাতর সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে অনেক ভাবনা-চিন্তা করা দরকার ছিল। মাত্র কয়েকজন সংসদ সদস্য বিশ্বের একটা অন্যতম সুন্দর সুরম্য ভবনে বসে এমন একটি সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে ভাবা দরকার ছিল যে, এই সিদ্ধান্ত জনগণের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া তৈরি করবে। অনেকে হয়তো এমন ব্যাখ্যা করবেন যে, সংসদীয় কমিটি হয়তো এই সিদ্ধান্ত এজন্যই নিয়েছে যে, সশস্ত্রবাহিনীতে কৃতিত্বের সঙ্গে ২০ বছর চাকরি করলেও তাঁদের মধ্যে কেউ দুর্নীতি দমন কমিশনের সদস্য হওয়ার যোগ্য নন। কেউ এমনও ভেবে বসতে পারেন যে, সশস্ত্রবাহিনীর কর্মকর্তাগণ যথেষ্ট সৎ নন। সংসদীয় কমিটির এই সিদ্ধান্ত সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে তাও কি সংসদীয় কমিটির ক্ষমতাধর সংসদ সদস্যগণ একবার ভেবে দেখেছেন? আমি মনে করি, সংসদীয় কমিটির সিদ্ধান্ত সম্পর্কে পত্রিকার পাতায় যে সাধারণ বাক্যটি প্রকাশিত হয়েছে তা শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের মনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করবে। নিঃসন্দেহে এটা দেশপ্রেমিক সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যদের পেশাগত সম্মান ও মর্যাদাকে হেয় প্রতিপন্ন করবে। এটা সরাসরি বৈষম্যমূলক আচরণ। আমাদের সংবিধানে আছে, কোনো কারণে কাউকে সমান সুযোগ পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। এটা মৌলিক অধিকারও বটে।

সশস্ত্রবাহিনীর প্রতিটি সদস্যই তাঁদের চাকরিতে যোগদানের সময় দেশের জন্য বিনা প্রশ্নে যুদ্ধের ময়দানে প্রাণ বিসর্জন দেয়ার অঙ্গীকার করে থাকেন। এমনকি এই অঙ্গীকারভঙ্গের জন্য অনেককে বিচারের সম্মুখীন হতে হয়। অনেক সময় সেই বিচারে একজন সামরিক কর্মকর্তার জীবন কেড়ে নেয়ার মতো অবস্থারও মুখোমুখি হতে হয়। তাই এটা যদি কেউ বলে যে, একটি বিশেষায়িত পেশা যেখানে দেশপ্রেম, সম্মান ও মর্যাদাটাই বড়, সেইরকম একটি পেশার সদস্যকে যদি কোনো-একটি গণতান্ত্রিক দেশের দুর্নীতি দমন কমিশনের মতো একটি কমিশনের সদস্য হওয়ার অযোগ্য ঘোষণা করা হয় —তার মানে কি এই দাঁড়াবে না যে, ওই পেশার সদস্যগণ দুর্নীতিবাজ? এবং এটা কি সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের প্রতি অনাস্থার ইঙ্গিত বহন করে না?

এভাবে এই বিলটি পাশ হলে কোনো কোনো পক্ষ এই শৃঙ্খলাপূর্ণ বাহিনীর সদস্যদের বিপথগামী করার সুযোগ পাবে। যারা দেশের ভালো চায় না এবং

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করতে চায় তারা নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার সুযোগ নিতে পারে এ থেকে। কারণ এটা বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে, দুর্নীতি দমন কমিশনের সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে যদি সশস্ত্রবাহিনীর ২০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মকর্তাদের অযোগ্য ঘোষণা করা হয় তবে তা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে।

শুনেছি 'শৃঙ্খলা বাহিনী'কে বাদ দেয়ার পক্ষে যুক্তি হিসেবে নাকি বলা হয়েছে, সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যগণ একটি সুশৃঙ্খলার মধ্যে থেকে কাজ করে। তাদের মধ্য থেকে কাউকে বেসামরিক একটি তদন্তমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করা ঠিক হবে না। সশস্ত্রবাহিনীকে সকল সমালোচনার ঊর্ধ্বে রাখার জন্যই নাকি তাদের মধ্য থেকে কাউকে দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার করা ঠিক হবে না। এর অর্থ কি এই যে, সংশ্লিষ্টরা ধরেই নিয়েছেন এই কমিশন বিতর্কের ঊর্ধ্বে উঠতে পারবে না? যারা শৃঙ্খলার মধ্যে থাকে তাদের দ্বারা এ-কাজ হবে না? শৃঙ্খলাটা কি আরো অযোগ্যতা? আর এই কমিশন কি উচ্ছৃঙ্খল লোক দিয়ে চালানো হবে?

আরেকটি প্রশ্ন আমি করতে চাই। সশস্ত্রবাহিনীতে কাজ করার অভিজ্ঞতা নিয়ে চাকরি থেকে অবসর নেয়ার পর যদি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়া যায়, উজির-নাজির হওয়া যায়, রাষ্ট্রদূত হওয়া যায়, প্রেষণে অন্য বিভাগে চাকরি করা যায় এবং সরকার পরিচালনায়ও অংশ নেয়ার ক্ষেত্রে কোনো বাধা না থাকে, তা হলে কেন দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার হওয়ার ক্ষেত্রে সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যদের অযোগ্য ঘোষণা করে আইন পাশ করা হচ্ছে? সশস্ত্রবাহিনীতে কাজ করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোনো দক্ষ কর্মকর্তার কি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মতো সাংবিধানিক সংস্থার সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বাধা আছে? নেই।

সংসদে প্রস্তাবিত বিলটির উদ্দেশ্য ও কারণসংবলিত বিবৃতিতে আইনমন্ত্রী বলেছেন, "প্রস্তাবিত বিলটি আইনে পরিণত হলে এবং উক্ত আইনের অধীন দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হলে সমাজ হতে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও দমন করা সম্ভব হবে। উপরন্তু উহা সমাজ ও প্রশাসনে বিদ্যমান দুর্নীতি প্রতিরোধের পাশাপাশি সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং জনপ্রশাসনে শুদ্ধতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে আশা করা যায়।" যদি তা-ই হয় তবে কেন সমাজ, প্রশাসন ও দেশের একটা ভালো কাজে কিছু অবদান রাখার সুযোগ থেকে সশস্ত্রবাহিনীর অভিজ্ঞ ও দক্ষ কর্মকর্তাদের বঞ্চিত করা হবে?

কমিশনার হওয়ার যোগ্য বলে যে-কয়েকটি পেশার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার বাইরেও এমন অনেক মহৎ পেশা রয়েছে, যে-পেশার ২০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন যে-কেউই দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার হওয়ার যোগ্যতা রাখেন। কিন্তু এঁদের মধ্যে যদি কেউ সরকারি চাকরি অর্থাৎ প্রশাসনের সদস্য না হন তা হলে তেমন কাউকে কমিশনার পদে নিয়োগ দেয়া যাবে না। আমি জানি না অন্য যেসব পেশার কথা উল্লেখ করা হয় নি সেসব পেশায় প্রবীণ ও অভিজ্ঞ

সদস্যগণ বিষয়টিকে কীভাবে নিচ্ছেন। এ-প্রসেঙ্গ একটি কথা বলতে হয়। নেপোলিয়ান বলেছিলেন, শত্রু যখন কোনো ভুল পথে অগ্রসর হয় তখন তাকে মাঝপথে বাধা দেয়া বোকামি। বাকিরা কি এ-উপদেশ জেনেই এখনও চুপ করে আছেন?

হয়তো আমিও তাদের মতো নীরব থাকতাম যদিনা সংসদে উত্থাপিত বিলে সুনির্দিষ্ট করে 'শৃঙ্খলা বাহিনী'র কথা উল্লেখ থাকত। এখন কথা হচ্ছে, প্রস্তাবিত বিলটিতে শৃঙ্খলা বাহিনীর কথা যদি প্রথমে রাখাই হলো তা হলে কেনই-বা এখন তা বাদ দিয়ে একটি বিশেষ পেশাকে আমার মতে হেয় প্রতিপন্ন ও অপমান করা হচ্ছে। আমি আশা করব, সংসদীয় কমিটির সুপারিশসহ বিলটি যখন আবার সংসদে ফেরত আসবে তখন নিশ্চয় সশস্ত্রবাহিনীর যেসব সদস্য সংসদ আলো করে আছেন তাঁরা এ-বিষয়ে কথা বলবেন। সশস্ত্রবাহিনীর একজন সাবেক সদস্য হিসেবে সংশ্লিষ্টগণ তাঁদের সুযোগমতো বিষয়টি নিয়ে নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে কথা বলে নিজ নিজ পেশার সম্মান ও মর্যাদাকে সমুন্নত রাখতে সচেষ্ট হবেন—এটাই একজন অবসরপ্রাপ্ত ও গর্বিত মুক্তিযোদ্ধা সৈনিক হিসেবে আমার প্রত্যাশা।

সবশেষে আর একটি কথা বলতে চাই, আলোচিত দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনারদের মনোনীত করার যে বাছাই কমিটির প্রস্তাব করা হয়েছে, তাতে প্রশাসনের একজন সদস্য রাখা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব যিনি সর্বশেষ বিদায়ী, তাঁকে এই বাছাই কমিটির সদস্য করা হয়েছে। আমার প্রশ্ন, চাকরিতে থাকা অবস্থায় কিংবা পরে যদি তাঁর বিরুদ্ধে কোনো দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপিত হয় তা হলেও কি তিনি বাছাই কমিটির সদস্য থাকবেন?

একজন দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে বলব, বিলটি যখন রাষ্ট্রপতি ও বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়কের কাছে উত্থাপন করা হবে তখন সব দিক বিবেচনা করেই তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত নেবেন বলে আমি বিশ্বাস করি।

*প্রথম আলো* ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৪

# লেখাটি কেউ পড়লে খুশি হব

প্রথমে নিজের পরিচয়টা দিই। আমি একজন নিয়মিত করদাতা। মূলত এজন্যই লেখার সাহস করছি। বর্তমানে অবসর জীবনযাপন করছি এবং ঢাকায় থাকি। পত্রপত্রিকা পড়ে সময় পার করছি। সেই সূত্রেই সম্প্রতি জানলাম নিউমার্কেট এলাকার সব ফুটপাত হকারমুক্ত করা হয়েছে। হয়তো নগরজীবন, নাগরিক শোভা এসবের সঙ্গে তারা বেমানান। বিশেষ করে দারুণ সব শোভাবর্ধনকারী ইট দিয়ে যখন ফুটপাত তৈরি করা হয়েছে, তখন সেটা কীভাবে হকারের ছিন্ন টুকরির নিচে চাপা পড়ে থাকে? আর এটা তো বানানো হয়েছে পথচারীদের জন্য।

নিউমার্কেট এলাকায় আমার তেমন কোনো কাজ পড়ে না। তবুও বুঝতে পারি, ফুটপাত মুক্ত থাকায় সাধারণ মানুষের অনেক উপকার হচ্ছে। তাই এ-প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাতে হয়। তবুও মনের কোণায় প্রশ্ন উঁকি মারে, এই নিরীহ হকারদের, ছিন্নমূল ব্যবসায়ীদের কী অনিশ্চয়তার মধ্যে কোথায় যে ঠেলে দেয়া হলো! আমাকে যারা চেনেন তাদের কাছে এটুকু পড়ে হয়তো খটকা লাগতে পারে। কারণ আমি থাকি গুলশানে, একটি ফ্ল্যাটে। গুলশানের মানুষের কি আর কোনো অসুবিধা থাকে, না কোনো মুশকিল?

তো এখানে কোনো ছিন্নমূল নয়, বরং কিছু 'বিত্তমূল' ব্যবসায়ী ফুটপাত দখল করে আছেন। জনগণের কাঁধের ওপর পা রেখে তাঁরা দিব্যি ব্যবসা করে যাচ্ছেন। তাঁদের টিকিটিও কেউ ছোঁন না।

আমার বাসা থেকে বের হয়ে ডান দিকে গেলে গুলশান দুই নম্বর। সে পথের প্রশস্ত পরিচ্ছন্ন ফুটপাত ধরে হাঁটতে শুরু করলে দেখবেন হঠাৎ ফুটপাতটা মাথা নুইয়ে রাস্তার সঙ্গে মিশে গেছে। এটা ওয়ান্ডারল্যান্ডের সম্মুখভাগ। এখানে এসে ফুটপাতে তথা সিটি করপোরেশনের মাথা মাটিতে আছড়ে পড়ার কারণ কী? কারণ আর কিছু না, ফুটপাতের ওপর গাড়ি পার্কিংয়ের সুযোগ করে দেয়া। হ্যাঁ, সে-ফুটপাতে দিব্যি গাড়ি পার্কিং হয় এবং এক পর্যায়ে তা রাস্তা দখল করে। পরিণতি যানজট। ফুটপাতের পথচারীদের কী হাল হয় তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

দিনের পর দিন এভাবে চলছে। সাধারণ করদাতাদের ঘাড়ে পা রেখে সুটকোট পরা সাহেবরা ব্যবসা করছেন।

এদের আগেই একটি বিদেশী এয়ারলাইনের অফিস। এঁরা ওয়ান্ডাল্যান্ডের মতো মাথা-নোয়ানো ফুটপাত পান নি। তাই উঁচু ফুটপাতের উপরেই ৭/৮টা গাড়ি তুলে রেখে দেন।

এবার চলুন এক নম্বরের দিকে, আমার বাসা থেকে বাঁ দিকে। এখানে একটা বিদেশী ব্যাংক আছে, দেশীগুলোর কথা আর বললাম না। তাদের সিকিউরিটি গার্ডরাই এখানে ট্রাফিক কন্ট্রোল করে। ফুটপাত আর রাস্তার উপর একে-একে সার বেঁধে তারা তাদের গ্রাহকদের গাড়ি পার্কিং করায়। সাধারণ লোকজনকে ভোগান্তিতে ফেলে, যানজট পাকিয়ে তারা গ্রাহকসেবা করে। দুঃখের কথাই বটে; আমি নিজেও এই ব্যাংকের গ্রাহক এবং আমাকেও । থাক। তো, ব্যাংক বিশ্বের অন্যান্য দেশে তাদের শাখাগুলো এমনটি করতে পারে কি না তা তাদের জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে। এ-লাইনে অন্য প্রায় প্রতিষ্ঠানেরই এক অবস্থা।

এরপর আসুন মহাখালীর দিকে। ব্র্যাকের বিরাট অফিস। বিশ্বের সবচেয়ে বড় এনজিও। তাদের ভেতরে পার্কিংয়ের ব্যবস্থা আছে। তাদের সামনের রাস্তায় 'নো পার্কিং' সাইনবোর্ড আছে। অথচ তার নিচেই দিব্যি সার বেঁধে গাড়ি পার্ক করা হচ্ছে। এভাবে মহাখালী পর্যন্ত স্কয়ার, রহিম আফরোজ, নিটোল, কনকর্ড টাওয়ারসহ বড় সব ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের সামনে রাস্তায়ই বিকারহীনভাবে প্রাইভেট গাড়ি এমনকি বাস পর্যন্ত পার্কিং করা হয়।

আসেন বড় স্কুল স্কলাস্টিকায়। আল্লা মালুম, পার্কিংয়ের কোনো ব্যবস্থা আছে কি না। প্রায়ই দেখি, স্কুল ছুটি হওয়ার আগ থেকেই রাস্তার এক পাশে বন্ধ করে দেয় তাদের গার্ডরা। বড় বড় সাহেব আর তাদের বেগম সাহেবরা-ড্রাইভাররা দু-তিন সারি করে রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখেন। শহর থেকে রিকশা তুলে দিলেও যে কোনো ফায়দা বৃদ্ধি হবে না, এরা তার প্রমাণ।

আবার ফুটপাতের বিষয়ে আসি এবং গুলশান-বারিধারার কথাই বলি। কারণ এখানে হকারের ঝামেলা নেই। নতুন, সুন্দর, প্রশস্ত ফুটপাত দেখে হয়তো ইচ্ছে হলো একটু হাঁটবেন। হাঁটতে শুরু করলেন। একটু পর শুনলেন ঢংকরে একটা শব্দ হলো আর আপনি মাথা ঘুরে ভূপাতিত। কারণ আপনি তো ভদ্রলোক। আপনার মাথায় এটা কাজ করবে না যে, ফুটপাতের মাঝখানে স্টিলের মোটা মোটা পিলার কেউ পুঁতে রাখতে পারে! হ্যাঁ, আমাদের দেশটা যে স্বাধীন এটা আমরা প্রায় ভুলে যাই বলেই যত সমস্যা। এখানে কেন্দ্রীয় বলুন, স্থানীয় সরকার বলুন, সিটি করপোরেশন বলুন সব্বাই স্বাধীন। এদের সঙ্গে জুটেছে ব্যবসায়ী নামের কিছু লোক—তারা যা ইচ্ছে করতে পারে। না হলে কোনো সভ্য মানুষের মাথায় এ-চিন্তা আসে কী করে যে, ফুটপাতের ঠিক মাঝখানটায় যেখান দিয়ে লোকজন হাঁটে, সেখানে পিলার বসিয়ে জাত-বেজাতের সাইনবোর্ড-বিলবোর্ড ঝোলাতে হবে। আমি তত্ত্বাবধায়ক সরকারে থাকার সময় বহুবিজ্ঞাপিত কিছু পণ্য বিএসটিআইয়ে

পরীক্ষা করাই। ফলাফল, অধিকাংশ পণ্যই নিম্নমানের। আমাদের স্বাধীন গণমাধ্যম বিজ্ঞাপন হারানোর ভয়ে সেসব পণ্যের নাম পর্যন্ত প্রকাশ করে নি। তাই 'কালা ফারুকীয়' কায়দায় বড়লোক হওয়া এই ব্যবসায়ীরা চাইলে মানুষের মাথা ফুটো করে (ফুটপাত তো কোন ছার!) ডাণ্ডা ঢুকিয়ে তার ওপর বিজ্ঞাপন ঝুলিয়ে দেবে। কে রুখবে তাদের?

এ তো গেল দেশী ভাইদের কথা। এবার আসুন এখানে চাকরি করতে আসা বিদেশীদের কথায়। তার আগে আমার নিজের একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। বেশ কটি দেশে আমাকে রাষ্ট্রদূতের চাকরি করতে হয়েছে। একবার একটি দেশে (নাম বললাম না) বাংলাদেশ দূতাবাসের নিজস্ব বাউন্ডারির ভেতরে একপাশে আমরা একটি গ্যারেজ তৈরি করতে শুরু করি। কিন্তু পাশের প্লটের মালিক তাতে আপত্তি জানান এই বলে যে, ওই জায়গায় গ্যারেজ করলে গাড়ির শব্দে তাদের অসুবিধা হবে। ব্যস, আটকে গেল কাজ। এই অফিস সেই অফিসে দৌড়াদৌড়ি। জবাব একটাই, প্রতিবেশীর অসুবিধা করা যাবে না। পরে সেই ভদ্রলোককে বুঝিয়ে-শুনিয়ে তিনমাস পর আমরা দূতাবাসের গ্যারেজ করতে সক্ষম হই।

আর আমাদের এখানে? অধিকাংশ দূতাবাসের সিকিউরিটি রুম, দর্শন প্রার্থীদের বসার জায়গা তাদের নিজস্ব বাউন্ডারির বাইরে। হয় ফুটপাতে না হয় খোদ রাস্তার ওপর। বেশির ভাগ দূতাবাসে গেলে এমনটি দেখতে পাবেন। নিজেদের সীমানার মধ্যে থাকতে তাদের অসুবিধা কোথায়?'

মাঝে মাঝে শুনি এখানে বিদেশী রাষ্ট্রদূত-হাইকমিশনার ও দাতা সংস্থাগুলো আমাদের সরকারকে, বিরোধীদলকে নসিহত করে এবং প্রায়ই তা প্রকাশ্যে সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে। এজন্য তাদের কেউ কিছু বলে না। আসলে ওই চৌকিদারের ঘর বানাতে গিয়েই তারা বুঝে গেছে এখানে সীমালঙ্ঘন করা যায়।

তো, যারা বিভিন্ন ফুটপাতের হকার উচ্ছেদের নির্দেশ দেন, পরিকল্পনা করেন তাদের সুদৃষ্টি (ভয়ার্ত দৃষ্টি নয়) যেন গুলশান-বনানী-বারিধারার দিকেও পড়ে সে-কামনা করছি। হকার উচ্ছেদের চেয়ে বেশি পুণ্য হবে এখানকার জঞ্জাল সাফ করলে।

*প্রথম আলো* ১৯ নভেম্বর ২০০২

# রাজনৈতিক সদিচ্ছা প্রয়োজন

বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে উন্নত-অনুন্নত কোনো দেশই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সুরক্ষিত নয়। বিগত দিনে স্পেন ও ইংল্যান্ড সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয়েছে এবং সেসব বোমা-হামলায় অনেক লোকের প্রাণহানি ঘটেছে। তবে ১৭ আগস্টের ঘটনা আমার জানা মতে, বিশ্বের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ইতিহাসে বিরল একটি ঘটনা। মাত্র ৩০ মিনিটের ব্যবধানে বাংলাদেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অর্থাৎ দেশের ৬৪ জেলার মধ্যে ৬৩টিতেই একই সময়ে কয়েকশ বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। একজন পেশাজীবী সৈনিক হিসেবে এটি আমাকে হতবাক করেছে। এরকম দৃষ্টান্ত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ইতিহাসে আর কোনো দেশে হয়েছে বলে আমার জানা নেই। এমনকি আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধেও এরকম সুসমন্বিতভাবে ও বিস্তৃত এলাকাজুড়ে আক্রমণ করার উদাহরণ নেই, যেটা গত বুধবার ঘটে গেল।

অন্যদের মতো আমি এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি, ঘৃণা জানাচ্ছি। যারা এধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে, তারা স্পষ্টতই রাষ্ট্রদ্রোহী। অনিচ্ছাসত্ত্বেও পেশাদারি দৃষ্টিভঙ্গি (প্রফেশনাল পয়েন্ট অব ভিউ) থেকে বলতে হচ্ছে, এ-কাজটি ঘটানো হয়েছে সুপরিকল্পিত, সমন্বিতভাবে দক্ষতার সঙ্গে এবং এর মাধ্যমে তারা তাদের উদ্দেশ্য সফল করতে পেরেছে। স্বাভাবিকভাবেই এ-ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সফলতার অর্থ দাঁড়ায় দেশের বিদ্যমান আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতি বিদ্রূপ ও বৃদ্ধাঙ্গুল প্রদর্শন করা। এটা আমাদের জনগণের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত বিভিন্ন সরকারি সংস্থার অদক্ষতার পরিচয় বহন করে, যারা জনগণের নিরাপত্তা দিতে অক্ষম।

এই ঘটনার মাধ্যমে দেশের স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হয়েছে এবং দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে। একজন সাধারণ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দেশ ও জনগণের নিরাপত্তার কথা ভেবে আমি শিউরে উঠি। দেশজুড়ে গত বুধবারের বোমা হামলার ঘটনা আমার কাছে দুঃস্বপ্নের মতো। এত কষ্টে অর্জিত আমাদের এই দেশকে এই পরিস্থিতিতে নিয়ে আসার জন্য আমি, আমরা ও আমাদের

সামাজিক মূল্যবোধই দায়ী। কিন্তু তার চেয়েও বেশি দায়ী হলো যারা বিভিন্ন সময় রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন। ১৯৯৯ সালে যশোরের উদীচীর বোমা-হামলা থেকে শুরু করে ২০০৫ সালের ১৭ আগস্টের এই ঘটনার আগ পর্যন্ত পাঁচ শতাধিক নানা ধরনের ছোট-বড় বোমা ও গ্রেনেড-হামলার ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু কোনো ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং সঠিক বিচার হয় নি। আমি মনে করি এর ফলে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড দিন-দিন বেড়েই চলছে। তার পরও আমাদের দেশের দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আইনের সঠিক প্রয়োগ হচ্ছে না; হলেও তা অত্যন্ত দুর্বল এবং অনেক ক্ষেত্রে পক্ষপাতমূলক। সংখ্যা দিয়ে দক্ষতা পূরণ করা যায় না। শুধু আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর জনবল ও সরঞ্জাম বৃদ্ধি, নতুন নতুন বাহিনী তৈরি এবং কমিটি গঠন আর সভা-সমিতি করে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড কমানো যাবে না। এর জন্য চাই সর্বস্তরে সুযোগ্য নেতৃত্ব এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছা। এসব কর্মকাণ্ড নিয়ে কিছু রাজনীতিবিদের বক্তব্য ও বিবৃতিতে সংকীর্ণ মানসিকতা এবং দেশের স্বার্থবিরোধী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এর ফলে সরকারি কর্মচারী এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে রাজনীতি এত বিস্তৃত যে, তাদের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কার্যকলাপ রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। এটা অত্যন্ত আত্মঘাতী প্রবণতা। এর ফলে অদক্ষ, অযোগ্য, দুর্নীতিবাজ এবং দেশপ্রেমবিবর্জিত লোকজন এসব বাহিনীতে সম্পৃক্ত হয়ে এসব সংস্থাকে জনবিরোধী করে তুলছে। এসব বাহিনীর নেতৃত্ব দেয়া এবং পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজন দক্ষ নেতৃত্ব। ফাঁপানো অন্তঃসারশূন্য বক্তৃতা, আনুগত্য এবং লোক-দেখানো বাহিনীর মহড়া দিয়ে এ-সমস্যার সমাধান করা যাবে না। সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য যে-ধরনের সততা, কঠোর মনোভাব এবং অরাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দরকার, সেটার অভাব লক্ষ করছি। কখনও কখনও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দক্ষতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়, কিন্তু তাও যেন মনে হয় লোক-দেখানো।

আমাদের দেশের রাজনীতি এখন রুগ্ণ। দুর্নীতি ও সন্ত্রাস রাজনীতিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। সুস্থ, স্বচ্ছ ও গণমুখী রাজনীতিই হলো সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানের প্রথম পদক্ষেপ।

বিগত অনেক দিন থেকে আমরা দেখে আসছি আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর অদক্ষতা, কর্মহীনতা ও দুর্নীতির সঙ্গে সম্পৃক্ততার চিত্র। তাদের অদক্ষতা ও কর্মহীনতা বহুবার জনগণের সম্মুখে প্রকাশ পেয়েছে। যেমন গত বছরের ২১ আগস্ট বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে গ্রেনেড-হামলা, ব্রিটিশ হাইকমিশনারের ওপর হামলা এবং সাবেক অর্থমন্ত্রীর ওপর গ্রেনেড হামলার সময় এদের নিষ্ক্রিয়তা ও পরবর্তী সময়ে অন্তঃসারশূন্য তদন্তে তাদের অদক্ষতা ও কর্মহীনতা প্রকাশ পেয়েছে।

ঢাকা শহর ছাড়াও অন্যান্য শহরে গেলেই দেখা যায়, প্রতি এক-দেড় শ গজের মধ্যে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা লক্ষ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা করছে। তাদের কর্মকাণ্ডের কোনো উদ্দেশ্য কি আছে? এসবের তদারকি ও মূল্যায়ন করা

হয় কি না আমার জানা নেই। গত বুধবার ঢাকাসহ ৬৩ জেলায় প্রায় সব ক্ষেত্রেই আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কমবেশি উপস্থিতি সত্ত্বেও এত বড় ঘটনা ঘটে গেল। ভেবে আশ্চর্য হতে হয়, যদিও এ-কর্মকাণ্ডে শত শত সন্ত্রাসী জড়িত ছিল এবং অনেক আগে থেকেই তারা এর জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে। রাজনীতিবিদদেরও মনে রাখা উচিত সন্ত্রাসীদের মূলমন্ত্র হচ্ছে লাশের ওপর দিয়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো।

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে 'প্রো-অ্যাক্টিভ অ্যাপ্রোচ' গ্রহণ করতে হবে এবং 'রি-অ্যাকটিভ অ্যাপ্রোচ' বর্জন করতে হবে। সন্ত্রাসীদের পরাজিত করতে হলে দলমত নির্বিশেষে রাজনৈতিক সদিচ্ছা প্রয়োজন। কাদা-ছোঁড়াছুঁড়ি এবং রাজনৈতিক ফায়দা লোটার জন্য অকারণে একে অন্যকে দোষারোপ করা ঠিক নয়।

দেশ পরিচালনাকারীদের মনে রাখতে হবে, রাজনীতির স্বার্থে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ব্যবহার আত্মঘাতী হয়ে পড়তে পারে। ইতিহাস থেকে রাজনীতিবিদরা আশা করি এ-শিক্ষা নেবেন।

*প্রথম আলো* ১৯ আগস্ট ২০০৫

# গৃহযুদ্ধ বিপ্লব নাকি জাতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধ

কোনো দেশে যখন ন্যূনতম সমন্বয় ছাড়া গণউত্থান ঘটে, যার লক্ষ্য থাকে বিদ্যমান সামাজিক, রাজনৈতিক কাঠামো ও সর্বস্তরে ক্ষমতাসীন নেতৃত্বে পরিবর্তন ঘটানো, তখন তাকে বিপ্লব (Revolution) বলে। কিন্তু সচরাচর বিপ্লবের হোতারা 'জনগণের অংশগ্রহণে সংঘটিত হয়েছে' এমনটা দেখানো বা বোঝানোর জন্য সামরিক অভ্যুত্থানকে বিপ্লব বলে প্রচার করে থাকে। বামপন্থি চেতনার সংশ্রব থাকে বিপ্লবে।

আবার যখন জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী বিভক্ত হয়ে তাদের অনুসারীদের নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মাধ্যমে কোনো সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে এবং তাদের একটি অংশ শেষ পর্যন্ত ক্ষমতা দখল করে তখন তাকে বলে গৃহযুদ্ধ। বর্তমানে ক্ষমতাসীনরা এ-ধরনের যুদ্ধকে 'দেশবিরোধী অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা' বলে চালিয়ে দেয়।

সামরিক অভ্যুত্থানেরই দক্ষিণ আমেরিকান ও স্পেনীয় সংস্করণ প্রোনানসিয়েমেন্তো। এ-প্রক্রিয়া সাধারণত একজন মাত্র সামরিক অধিকর্তার দ্বারা সংঘটিত হয় এবং তিনি পুরো সামরিক বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে ক্ষমতা দখল করেন। অপরদিকে সামরিক বাহিনীর একটি অংশ তাদের নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে নেতা নির্বাচন করে তাকে সামনে রেখে ক্ষমতা দখল করলে তাকে বলা হয় পুশে (Putsch)। এটা সাধারণত কোনো দেশে যুদ্ধ চলাকালে অথবা যুদ্ধের পরপরই ঘটে থাকে। পুশেতে ডানপন্থি চেতনার প্রভাব থাকে।

ক্যু-দেতায় সচরাচর জনগণের কোনো সংশ্রব থাকে না। সামরিক বাহিনীর একটা অংশ যে-কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করে ক্ষমতা দখল করে। ক্ষমতা দখলের পর তারা রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয় অথবা একটা যোগসূত্র তৈরি করে। এতেও সাধারণত ডানপন্থি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

আর বিদেশী প্রত্যক্ষ সামরিক ও কূটনৈতিক প্রভাবে যদি কোনো দেশের সরকারকে উৎখাত করে আগ্রাসী দেশের নিজেদের পছন্দমতো লোকদের ক্ষমতায়

বসানো হয় তবে তাকে লিবারেশন বা স্বাধীনতা বলে। যেমন এখন প্রায়ই শুনবেন জর্জ ডব্লিও বুশ বুক ফুলিয়ে বলছেন, 'উই হ্যাভ লিবারেটেড ইরাক'।

**জাতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধ, বিদ্রোহ ইত্যাদি**

ব্যবস্থায় একই রাষ্ট্রের মধ্য থেকে ক্ষমতা দখল করা উদ্দেশ্য নয়। মূল উদ্দেশ্য থাকে ওই রাষ্ট্রের মধ্য থেকে আরেকটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম দেয়া। রাজনৈতিক অথবা জাতিগত বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে এ-ধরনের যুদ্ধ হয়ে থাকে।

ধন্যবাদ অধ্যাপক এডওয়ার্ড লুটওয়াককে (Edward Luttwak)। '৭১ সালকে অনেকে অনেক নামে ডেকে থাকেন বর্তমান বাংলাদেশে। এডওয়ার্ড লুটওয়াকের এই সংজ্ঞাগুলো থেকে আমরা বুঝতে পারব ১৯৭১ সালে ৯ মাস জুড়ে আমরা কী করেছিলাম। বিপ্লব করেছিলাম, গৃহযুদ্ধ করছিলাম, বিদ্রোহ করেছিলাম, না জাতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধ করেছিলাম? বলার অপেক্ষা রাখে না, আমাদের '৭১ ছিল জাতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধ। আমরা আমাদের রক্ত, ঘাম ও অশ্রুর বিনিময়ে একটা নতুন রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছি, যদিও ভারত সরকার আমাদের সাহায্য করেছিল এবং পরে সুযোগ বুঝে সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। যে-কোনো লোকের কাছে এটা ছিল পরিষ্কার যে, ভারত পাকিস্তান ভাঙতে চেয়েছিল, আর আমরা নতুন একটা রাষ্ট্র চেয়েছিলাম। ১৯৪৮ ও ১৯৬৫ সালে ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়েছিল। কিন্তু ফল ভারতের আশানুরূপ হয় নি। তাই '৭১ ছিল তাদের জন্য শতাব্দীর সেরা সুযোগ।

**কেন যুদ্ধ করেছি**

আত্মসম্মান, স্বাধীনতা ও দেশের জন্য ১৯৭১ সালে জীবনের নয়টি মাস মুক্তিযুদ্ধে কাটিয়েছি। ওই সময় শত কষ্টের মধ্যে এক মুহূর্তও এর জন্য অনুশোচনা হয় নি। বরং আত্মত্যাগের মহান ভাবনা আর গর্ব নিয়ে এগিয়ে গেছি একধরনের মানসিক তৃপ্তির মধ্য দিয়ে। পরবর্তী সময়ে সেনাবাহিনীতে ও ১৬ বছরের কূটনৈতিক জীবনে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করেছি। কিন্তু আর কখনও ফিরে পাই নি মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে অনুভূত সেই গর্ব, আত্মতৃপ্তি ও আনন্দ।

তবুও আজ যখন পেছনে ফিরে তাকাই তখন সেসব দিনের স্মৃতি শত ব্যথা ছাপিয়েও আমার ভেতরটা ভরে দেয় আনন্দে আর গর্বে। পাকিস্তানে প্রথম কর্মজীবন শুরু করা সত্ত্বেও আমার ভেতরে বাঙালি জাতিসত্তার উন্মোচন ছিল স্বাভাবিক। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন অফিসার থেকে মুক্তিযোদ্ধায় রূপান্তর ছিল এক অনিবার্য বাস্তবতায় বিশ্বের বুকে নিজের, দেশের ও জাতির অস্তিত্বের জানান দেওয়া। বাঙালি জাতিসত্তায় আমার বিশ্বাস আমাকে এই রূপান্তরে অনুপ্রাণিত করেছিল।

সেদিন এক সহজ-সরল দেশপ্রেমের আবেগে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু বিগত ৩২ বছরে বাংলাদেশে নানা পটপরিবর্তন আর একাধিক জাতীয় বিপর্যয়

আমার সব বোধকে ছিন্নভিন্ন করেছে। ট্র্যাজেডি আর হতবুদ্ধিতা আজও আমাদের জাতীয় জীবনের নিত্য ঘটনা। বলতে দ্বিধা নেই, একাত্তরের আগে ও যুদ্ধকালীন যাদের কাছে থেকে দেখেছি, স্বাধীনতা-উত্তরকালে তাদের আচরণ আমাকে বিস্মিত করেছে। অনেক রাজনৈতিক ও সামরিক ব্যক্তিত্বের প্রকাশিত লেখায় আত্মপ্রচার, ইতিহাসবিকৃতি ও সত্যের অপলাপ প্রত্যক্ষ করে মর্মাহত হয়েছি। বিগত বছরগুলোতে যেমন দেখেছি এক রক্তস্নাত নতুন দেশের অভ্যুদয়, তেমনি খুব কাছে থেকে দেখেছি তার স্বাধীনতা-উত্তর একাধিক ক্রান্তিলগ্ন। দেখছি কীভাবে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, তোষামোদ, ভণিতা, মিথ্যাচার, স্বার্থপরতা আর বিশ্বাসভঙ্গের হীন আবর্তে বাংলাদেশের স্বপ্নগুলো ক্রমাগত তলিয়ে যাচ্ছে।

## ফিরে দেখি সুখস্মৃতি

বিজয়ের মাস, আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের যারা সম্মুখসমরে ছিলাম তাদের গর্বের মাস ডিসেম্বর। আজ ছয় দিন পার হয়ে যাচ্ছে। এখন কত নিশ্চিত আমরা, ১০ দিন পর ১৬ ডিসেম্বর আমাদের বিজয় দিবস। যেন নিয়তির নির্ধারিত। কিন্তু সেদিন এ দিনটির জন্য জীবন বাজি রেখে লড়তে হয়েছে, ভাবনার অবকাশ ছিল কম। আজ অবসর আর বার্ধক্যের গ্যাঁড়াকলে বসে ভাবি, ’৭১-এর ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহটা কোথায় ছিলাম, কেমন ছিলাম, কী করছিলাম।

মনে পড়ে ১ ডিসেম্বর, ১৯৭১। তারায় তারায় খচিত আকাশের নিচে কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের রাত। থমথমে নৈঃশব্দ্য ভেঙে থেকে-থেকে ভেসে আসছে ঝিঁঝিপোকার ডাক। বিশাল বাঁশঝাড়ের অন্ধকারে জোনাকি পোকার রহস্যময় আনাগোনা।

স্থান আখাউড়ার অদূরে তিতাস নদীর তীরঘেঁষা সিঙ্গাইর বিল, মুকুন্দপুর ও আজমপুর। এই পুরো এলাকাটি তখন পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ পাঠান রেজিমেন্ট তথা ১২ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের দখলে। আর এই এলাকাকে শত্রুমুক্ত করার জন্য এখানে জড়ো হয়েছে দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রায় ৮০০ পোড়খাওয়া মুক্তিসৈনিক। এদের প্রায় সবাই ইতোমধ্যে নয় মাস ধরে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। মুকুন্দপুরের উল্টোদিকে তাদের অবস্থান। পেছনে আগরতলা বিমানবন্দর।

একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে কোম্পানি অধিনায়কদের সঙ্গে আমি আক্রমণের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি পরীক্ষা করছিলাম। আমার শরীরে তখন অজানা বিপদের অনুভূতি। এই তো চার মাস আগেই ময়মনসিংহের কামালপুরে মাত্র ঘণ্টাদুয়েকের যুদ্ধে চোখের সামনে শহীদ হতে দেখেছি ৩৫ জন সহযোদ্ধাকে, যদিও প্রতিটি খড়িতে আঁকা (সেট পিস) যুদ্ধের আঙ্গিক ভিন্ন, ভিন্ন তার ক্ষেত্র ও পরিবেশ। অভিজ্ঞতা থেকে জানি, এরকম যুদ্ধে রক্তপাত, একাধিক মৃত্যু ও ক্ষয়ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। সহযোদ্ধাদের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম ভোর না হতেই হয়তো অনেকের মুখেই অমোঘ মৃত্যুর ছায়া পড়বে। আসলে অবচেতন মনে মৃত্যুচিন্তা

যোদ্ধার নিত্যসঙ্গী। কিন্তু একজন অধিনায়ক মৃত্যুর এই ভাবনাকে ক্রমাগত পরাজিত করেন। তিনি সব ভয়কে লুকিয়ে রাখেন তাঁর আশাবাদী আচরণের আড়ালে।

আগেই ঠিক করা ছিল, রাত ১১টা ৪৫ মিনিটে ভারতীয় গোলন্দাজরা আমাদের আক্রমণে সহায়তা করার জন্য আগরতলা বিমানবন্দরের পেছন থেকে দূরপাল্লার ভারী কামানের গোলাবর্ষণ শুরু করবে। চারদিকের নৈঃশব্দ্য ভেঙে ঠিক সময়েই তা ঘটল। ভারতীয় গোলান্দাজ বাহিনীর লক্ষ্য পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ১২ নং এফএফ রেজিমেন্ট। আমাদের আক্রমণে সহায়তার জন্য সেদিন ভারতীয় বাহিনী গোলানিক্ষেপে কোনো কার্পণ্য করে নি। গোলাবর্ষণের প্রচণ্ডতা ও তীব্রতা ছিল এমন যে, অনেক দূরেও আমাদের পায়ের নিচের মাটি কাঁপছিল। আমার নেতৃত্বাধীন ব্যাটালিয়ন গোলাবর্ষণের সহায়তায় দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকে। শত্রুদের হটিয়ে তিতাস নদীর পাড়, মুকুন্দপুর, সিঙ্গাইর বিল আর আজমপুর মুক্ত করাই ছিল আমাদের লক্ষ্য। শত্রুবাহিনী থেকে ৪০০ মিটার দূরে থাকতেই পূর্বপরিকল্পনা অনুসারে বন্ধ হয়ে যায় দূরপাল্লার কামানের গোলাবর্ষণ। এরপর আমাদের সৈন্য এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মধ্যে শুরু হয় মেশিনগান আর রাইফেলের অবিরাম গোলাগুলি।

কুয়াশায় ঢাকা সে-রাতে যুদ্ধ পরিচালনা ছিল অত্যন্ত কঠিন। ভোর না হতেই শুরু হয় পাকসেনাদের তুমুল পালটা আক্রমণ। দূরপাল্লার ভারী কামান, মেশিনগান ও দুটো 'এফ-৮৬ সেবর জেটের' সাহায্যে তাদের এই পালটা আক্রমণ ছিল এককথায় প্রচণ্ড। ২ ডিসেম্বর সারা দিন এ-যুদ্ধ চলে। শেষ অবধি আমাদের পিছু হটাতে না পেরে ৩ ডিসেম্বর ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক ধরে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার দিকে পালিয়ে যায়। ফলে সিলেট-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া রেল ও মহাসড়কের মনতলা, হরষপুর, মুকুন্দপর থেকে শাহবাজপুর পর্যন্ত পুরো এলাকা আমাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

সেদিনের সেই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে হারিয়েছি অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে। এর মধ্যে মনে পড়ে ব্রাবো (বি) কোম্পানির কমান্ডার লেফটেন্যান্ট বদিউজ্জামানের নাম। যুদ্ধ চলাকালেই তাঁকে আজমপুর রেলস্টেশনের পাশে সমাহিত করা হয়। এই মহান মুক্তিযোদ্ধার নামে ঢাকা সেনানিবাসে একটি সড়কের নামকরণ করা হয় ১৯৭২ সালে। কিন্তু এই সড়কটির নাম পরিবর্তন করে 'স্বাধীনতা সরণি' করা হয়েছে। বদিউজ্জামানকে যেখানে সমাহিত করা হয় সেই আজমপুর রেলস্টেশনের নামকরণ করা হয়েছিল তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের সুবেদার আজমের নামে। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানি ছিলেন। ষাটের দশকে ওই সীমান্তে ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে তিনি নিহত হন।

যাহোক, সুবেদার আশরাফসহ আরও আটজন বীর মুক্তিযোদ্ধা আখাউড়া যুদ্ধে শহীদ হন, যাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে সেদিন আমরা একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল মুক্ত

করতে সক্ষম হই। এ ছাড়া ২০ জনেরও অধিক মুক্তিসৈনিক সে-যুদ্ধে আহত হন। অন্যদিকে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর ১২ এফএফের তিনজন সৈনিক আমাদের হাতে বন্দি হয়। আর পালানোর আগে তাদের ফেলে যেতে হয় ১২টি মৃতদেহ।

ওই যুদ্ধের সার্বিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে যৌথভাবে। উদ্দেশ্য ছিল, পুরোপুরি যুদ্ধ শুরু হলে ভারতীয় ট্যাঙ্ক ও সেনাবাহিনী যেন অতি সহজে এ-এলাকা দিয়ে প্রবেশ করে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও মেঘনা নদীর পাড়ের আশুগঞ্জ পর্যন্ত যাতায়াত করতে পারে। তাই এ-যুদ্ধের গুরুত্ব অনুধাবন করে ভারতীয় বাহিনীর পূর্বাঞ্চলের তৎকালীন জিওসি মেজর জেনারেল গনজালভেস এ-সম্পর্কে নভেম্বর মাসের শেষদিকে আমার সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

এর পরের তিনদিন অর্থাৎ ৪ থেকে ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত আমরা শাহবাজপুর এলাকায় ছিলাম। সীমান্তবর্তী অঞ্চল বিধায় যুদ্ধের প্রথম দিকেই বেশির ভাগ লোক ভারতে এবং কিছু লোক দূরদূরান্তে গ্রামাঞ্চলের দিকে চলে যায়। ফলে ওই সময় পুরো এলাকাটি প্রায় জনশূন্য ছিল। তাই সৈনিকদের খাবারদাবার জোগাড় করা বেশ কষ্টসাধ্য ছিল। দুই-তিনদিন পর একবেলা ভাত খেতে পাওয়া ছিল আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া।

### একটি প্রশ্ন

অনুপুঙ্ক্ষ কোনো বর্ণনা নয়। সংক্ষেপে ছয় দিনের যুদ্ধের কথা যতটুকু বলা যায় ততটুকুই বললাম। আসলে এসব তো গল্প নয়, বাস্তব। বাস্তবকে একসময় গল্পের আদলে বলতে হবে অথবা ওই সোনালি গল্প আদৌ কাউকে বলতে পারব এমন নিশ্চয়তা তো ছিল না। ওটা তো ছিল যুদ্ধ। আচ্ছা, একবার ভাবুন তো, বাংলাদেশ '৭১-এ হেরে গেল! আমরা যারা সম্মুখসমরে ছিলাম, অস্ত্র ধরেছিলাম তাদের কী পরিণতি হতো? এদেশের সাধারণ মানুষেরই-বা কী অবস্থা হতো?

*প্রথম আলো* ৬ ডিসেম্বর ২০০৩

### পাঠকের প্রতিক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে লেখকের বক্তব্য

উপর্যুক্ত শিরোনামে গত ৬ ডিসেম্বর বিজয়ের মাসে আমার একটা লেখা ছাপা হয়েছিল প্রথম আলোয়। ২৬ ডিসেম্বর এ-লেখার একটা প্রতিক্রিয়া ছাপা হয়। লিখেছিলেন প্রকৌশলী মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন খান। সেই প্রতিক্রিয়া আমি পড়েছি এবং তার একটা জবাব দেয়ার দায়বদ্ধতাও অনুভব করেছি। কিন্তু সময়ের অভাবে সঙ্গে সঙ্গে তা করা হয়ে ওঠে নি। সময় গড়িয়ে স্বাধীনতার মাস চলে এসেছে। তাই বিষয়টিকে এখনও সময়োপযোগী বলে মনে করছি। সরাসরি প্রসঙ্গে চলে যাই।

"আমাদের '৭১ ছিল জাতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধ। আমরা আমাদের রক্ত, ঘাম ও অশ্রুর বিনিময়ে একটা নতুন রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছি, যদিও ভারত সরকার আমাদের সাহায্য করেছিল এবং পরে সুযোগ বুঝে সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। যে-কোনো লোকের কাছে এটা ছিল পরিষ্কার যে, ভারত পাকিস্তান ভাঙতে চেয়েছিল, আর আমরা নতুন একটা রাষ্ট্র চেয়েছিলাম। ১৯৪৮ ও ১৯৬৫ সালে ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়েছিল। কিন্তু ফল ভারতের আশানুরূপ হয় নি। তাই '৭১ ছিল তাদের জন্য শতাব্দীর সেরা সুযোগ।"

আমার লেখার এই অংশটি নিয়ে ফরহাদ হোসেন খান প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন এবং *প্রথম আলো* তা প্রকাশ করেছে। ওপরের লেখাটি নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া ছিল এমন

"জেনারেল মইন ১৯৪৮ ও ১৯৬৫ সালের পাকিস্তান ও ভারতের যুদ্ধকে ১৯৭১ সালের আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে কীভাবে এক করে দেখেছেন, তা বোধগম্য নয়। ১৯৪৮ ও ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল কাশ্মীর নিয়ে বিরোধকে কেন্দ্র করে। পাকিস্তান ভারতের কাছ থেকে তাদের অধিকৃত কাশ্মীরের অংশ উদ্ধারের জন্য ভারত অধিকৃত অংশে পাকিস্তানি জঙ্গি অনুপ্রবেশকারী প্রেরণের মাধ্যমে উভয় ক্ষেত্রেই যুদ্ধের সূচনা করে কিন্তু কোনোবারই তাদের উদ্দেশ্য সাধিত হয় নি। উভয় ক্ষেত্রেই পাকিস্তানকে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফেরত আসতে হয়। ১৯৪৮ ও ১৯৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারতের যুদ্ধের ওপর জেনারেল মইনের উক্তিকে 'উদ্ভট' ছাড়া আর কী আখ্যায়িত করা যায়! উপরন্তু ১৯৪৮ ও ১৯৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারতের যুদ্ধের ওপর জেনারেল মইনের উক্তির ধারাবাহিকতায় আমাদের '৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তার উক্তি শুধু দুঃখজনক নয়, এটা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি অবমাননাকরও বটে।"

ফরহাদ খানের এই প্রতিক্রিয়া পড়ে আমি বিস্মিত হয়েছি। একজন প্রকৌশলী যদি এই লেখার এই ব্যাখ্যা করেন তা হলে আর কাদের জন্য লিখব! তবুও আমার লেখাটি পড়ার জন্য ফরহাদ খানকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সেইসঙ্গে অনুরোধ করছি সামগ্রিকভাবে চিন্তা করুন এবং তারপর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করুন।

ফরহাদ খানের লেখা পড়ে মনে হয়েছে তাঁর ক্ষোভের মূল কারণ—তাঁর ধারণা, আমি মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকার যথাযথ মূল্য তুলে ধরি নি। তাঁর এই ধারণা যে ভুল তা তাঁর লেখা থেকেই প্রমাণ করা যায়। তিনি এক জায়গায় লিখেছেন—"আমাদের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অংশগ্রহণ যে কত অপরিহার্য ছিল তা তো জেনারেল মইনের এ-লেখারই অন্য এক জায়গায় স্বীকার করা হয়েছে। ১৯৭১ সালের ১ ডিসেম্বর আখাউড়ার অদূরে তিতাস নদীর তীরে পাকিস্তানিদের সঙ্গে যুদ্ধে আগরতলা বিমানবন্দরের পেছন থেকে পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনীর প্রয়োজনীয় গোলাবর্ষণের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন তিনি। ভারতীয় বাহিনীর এ সাহায্য ছাড়া তাদের এ যুদ্ধ জয়ের কোনো সম্ভাবনা ছিল না।"

তার মানে ভারতকে গুরুত্ব দিয়েছি। আসলে যার যেখানে যতটুকু প্রাপ্য ততটুকু বলাই শ্রেয়। সাধারণীকরণের সুযোগে সত্যভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আগরতলার কাজের প্রশংসা পত্নীতলায় করা ঠিক বলে মনে করি না।

এ-পর্যন্ত বললেই আসলে ফরহাদ হোসেনের লেখার জবাব হয়ে যায়। কারণ তাঁর মূল ভাবনা ভারত নিয়ে। আমরা বাঙালিরাও যে কিছু করেছি তা নিয়ে তাঁর তেমন মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় নি লেখা পড়ে। নিজেদের কাজ নিয়ে গর্ব করতে দ্বিধা কোথায়! প্রাথমিক ও প্রধান ধাক্কাটা তো আমরা এদেশের মানুষই ঠেকিয়েছি। আমরা মরেছি, মেরেছি; তবে ঠেকিয়েছি। এই কৃতিত্ব তো আমি কাউকে দেব না। কারণ আমি মাঠে যুদ্ধ করেছি। নিয়মিত সেনাবাহিনীর অন্যতম একজন মেজর আমি, সরাসরি যুদ্ধ করতে চেয়েছি, সম্মুখসমরে থাকতে চেয়েছি এবং থেকেছিও ব্যাটালিয়ন কমান্ডার হিসেবে। কিন্তু ফরহাদ হোসেন আমার বিরুদ্ধেই মুক্তিযুদ্ধকে অবমাননা করার অভিযোগ তুলেছেন ভারতকে অপ্রয়োজনীয় কৃতিত্ব না দেয়ায়!

আমি আমার লেখায় রেভ্যুলেশন (বিপ্লব), গৃহযুদ্ধ, প্রোনানসিয়েমেন্তো, পুশে, ক্যু-ডেটা, লিবারেশন (স্বাধীনতা) এবং জাতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধ ইত্যাদির সংজ্ঞা দিয়েছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল '৭১ সালকে নানা নামে অভিহিত করার জটিলতা বা ভ্রান্তি সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা এবং জোর দিয়ে বলেছি যে, '৭১ ছিল আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধ বা ওয়্যার অব ন্যাশনাল লিবারেশন। আর লিবারেশন বা স্বাধীনতার সংজ্ঞায় বলেছি—"বিদেশী প্রত্যক্ষ সামরিক ও কূটনৈতিক প্রভাবে যদি কোনো দেশের সরকার উৎখাত করে কোনো দেশ নিজেদের পছন্দমতো লোকদের ক্ষমতায় বসায় তবে তাকে লিবারেশন বলে।" উদাহরণ দিয়েছিলাম— "এখন প্রায়ই শুনবেন জর্জ ডব্লিও বুশ তাঁর বক্তৃতা-বিবৃতিতে বলছেন—উই হ্যাভ লিবারেটেড ইরাক। মানে আমরা ইরাককে স্বাধীন করেছি।" সংজ্ঞার সঙ্গে তাঁর ঘোষণার মিলও আছে। তারা সেখানে একটা নিজস্ব সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। আমেরিকাই সবকিছু করেছে ও করছে।

ফরহাদ খানের কাছে প্রশ্ন—আমরা কি আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের সব কৃতিত্ব ভারতকে দিয়ে দেব? নিজেরা যা করেছি তার কৃতিত্বও অন্যকে দিয়ে দেব? নাকি তারা যতটুকু করেছে ততটুকুর কৃতিত্ব তাদের দেব?

এবার আসুন তাঁর ভাষায় 'উদ্ভট' প্রসঙ্গে। "১৯৪৮ ও ১৯৬৫ সালে ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়েছিল। কিন্তু ফল ভারতের আশানুরূপ হয় নি। তাই '৭১ ছিল তাদের জন্য শতাব্দীর সেরা সুযোগ।" আমার এই ব্যাখ্যাকেই ফরহাদ হোসেন খান উদ্ভট বলে ব্যঙ্গ করেছেন। '৭১ সম্পর্কে সামরিক বিষয়ে গবেষণার জন্য বিখ্যাত, ইংল্যান্ডের সাসেক্স ইউনিভার্সিটি থেকে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষা বুলেটিন (আইডিএস), ভলিউম ৯, নং-১, ১৯৭৭-এ প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞগণ যা বলেছেন তা এখানে হুবহু তুলে ধরছি পাঠকের জন্য—

"The Indian government had decided by the middle of April 1971, that it was in its own national interest to aid the resistance in East Pakistan. India had fought two inconclusive wars with Pakistan since independence and saw this was the opportunity of the century to cut its enemy to size and assert itself as the dominant power in the region." তা হলে কি আইডিএসের বিশেষজ্ঞরাও আমার মতো উদ্ভট!

ফরহাদ হোসেন আরও লিখেছেন, "মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে কোনো দেশকে স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে, যেমন করতে হয়েছে বাংলাদেশকে, তার অন্তত একটি শক্তিশালী বহিঃশক্তির সাহায্য প্রয়োজন হয়। অন্যথায় বিজয় অর্জন কঠিন হয়ে পড়ে।"

দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, কোনো দেশের নাগরিকরা যদি এ-ধরনের মানসিকতা পোষণ করে থাকে তবে তা হবে সে-দেশের জন্য বিপজ্জনক। এ ধরনের মনমানসিকতা থাকলে তো কোনো লোক দেশের বিপদে অথবা দেশের জন্য যুদ্ধ করতে এগিয়ে আসবে না। কারা কারা আমাদের সাহায্য করবে সে-হিসাব কষতেই সময় চলে যাবে। '৭১ সালে যদি আমরা এমন চিন্তা করতাম তবে আর যুদ্ধে যাওয়া হতো না। মনে রাখতে হবে, "Nobody gives you freedom, you have to fight for it." প্রথমে নিজেকে মাঠে নামতে হবে। তারপর স্বার্থের বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে কোনো কোনো দেশ হয়তো সাহায্যের হাত বাড়াবে। কারণ দুটি দেশের মধ্যে কখনো আবেগ-অনুরাগের সম্পর্ক থাকে না। বাস্তবতার শক্ত জমিনে দাঁড়িয়ে সবাই যার যার স্বার্থ দেখেন এবং তার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও যুদ্ধের কলাকৌশল। যুদ্ধের সময় এই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই সূত্রটি অনুসরণ করে বলে প্রতীয়মান হয়। সূত্রটি হলো— Enemy's enemy my friend'—দুশমনের দুশমন আমার বন্ধু।

ফরহাদ হোসেন আরো লিখেছেন, "একটি বৈরী পরিবেশের মধ্যে কীভাবে মাত্র নয় মাসে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে তা বুঝতে কারো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।"

আমার প্রশ্ন, বৈরী পরিবেশ বলতে তিনি কী বোঝাতে চেয়েছেন? যুদ্ধের পরিবেশ তো বৈরীই হয়। তবে আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার এই যুদ্ধে গুটিকয়েক লোক ছাড়া দেশের আপামর জনসাধারণের সক্রিয় সমর্থন ছিল এবং এজন্য এত অল্প সময়ে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের জন্য এর চেয়ে উপযুক্ত পরিবেশ এর আগে কখনও তৈরি হয় নি এই দেশে। ফলে একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার কাছে তখনকার পরিবেশ ছিল যুদ্ধের জন্য অনুকূল।

*প্রথম আলো* ২৭ মার্চ ২০০৪

# সেনা অভিযান ও আমাদের ভবিষ্যৎ

আমাদের দেশে কিছু লোক সুযোগ পেলেই বলেন, সেনাবাহিনীতে যারা চাকরি করে তারা মূর্খ টাইপের মানুষ। এদের আর লেখাপড়াই-বা কতটুকু? প্যারেড করতে করতে বুদ্ধি হাঁটুতে নেমে গেছে ইত্যাদি। ব্যক্তিগতভাবে আমার জন্য এ-ধরনের মন্তব্য আনন্দের ও স্বস্তিদায়ক। পড়ালেখা আসলেই জানি না, বিশেষ করে লেখাটা। তবে পড়তে পারি। অবসরে এখন পত্রিকায় প্রকাশিত নানাজাতের কলাম পড়ে জীবনের 'ডিপার্চার লাউঞ্জে' বসে সময় কাটাই।

নিজের অভিজ্ঞতা থেকে কলাম-লেখকদের আমি মনে-মনে দুভাগে ভাগ করে রেখেছি। এক হচ্ছেন, যাঁরা নতুন কোনো অভিজ্ঞতা, তথ্য বা নির্দিষ্ট পরিবেশ পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে লেখেন তাঁরা। এদের সংখ্যা কম। তবে এঁদের লেখা পড়ে অনেক কিছু জানা যায়, নতুন চিন্তারও খোরাক থাকে তাতে। আরেক দল আছেন, এঁরা নিয়মিত লিখেন এবং হেন কোনো বিষয় নেই যে তাঁরা লিখেন না। এদের মধ্যে আবার একটা অংশ আছেন সপ্তাহে নিয়মিত কয়েকটা কাগজে লিখেন। এ-ধরনের লেখকদের একটা কমন সমস্যা আমার চোখে লেগেছে। তা হলো কোনো বিষয় না পেলে বা বিষয় সম্পর্কে ভালোভাবে না জানলেও এঁরা কারও লেখাকে আক্রমণ করে একটা কিস্তি ফাঁদেন।

সাংবাদিক-কলাম লেখক এবিএম মূসার এরকম এক কিস্তির ফাঁদে পড়ে আমাকে এ-লেখাটা লিখতে হচ্ছে। শারীরিক-মানসিক দুদিক থেকেই এটা আমার জন্য কষ্টকর। তবুও অবসরে আছি বলে লেখার চেষ্টা করছি। তিনি 'গুরুত্বপূর্ণ' দাবি করে প্রথম আলোর গোলটেবিল আলোচনায় দেয়া আমার বক্তব্যের কিছু অংশ উদ্ধৃত করে শঙ্কিত হওয়ার নামে আমাকে বেকায়দায় ফেলতে চেয়েছেন। তাঁর লেখায় প্রসঙ্গক্রমে অন্য আলোচকদের নামও এসেছে। তবে পড়ে আমার ক্ষুদ্রজ্ঞানে মনে হয়েছে টার্গেট ছিলাম আমি।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, সেনা অভিযান ও আমাদের ভবিষ্যৎ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় গত ৩০ নভেম্বর। ১২ ডিসেম্বর সে-আলোচনার

বিস্তারিত বিবরণ প্রথম আলো ক্রোড়পত্র আকারে প্রকাশ করে। পত্রপত্রিকার লোক না হলেও এটুকু বুঝতে পারি, স্থান-সংকুলান এবং অহরহ-বলা মুখের কথা লেখায় তুলে আনার সমস্যা (অনেক কিছু অনেক সময় অভিব্যক্তিতে প্রকাশ পায়, লেখায় তা হয়তো তুলে আনা কষ্টকর) ইত্যাদি কারণে হুবহু বক্তব্য ছাপা সম্ভব হয় না। শব্দ বা বাক্য কাটা পড়ে। তবুও যা ছাপা হয়েছে তাতে সবার বক্তব্যই মোটামুটি পরিষ্কার বোঝা যায়।

"১৯৭২ সাল এবং এর পরও আমি ঢাকার আর্মি কমান্ডার ছিলাম। তখন কিন্তু এ-প্রশ্ন ওঠে নি কোন আইনে সরকার সেনাবাহিনী এনেছে? তখন আইনটা মুখ্য বিষয় ছিল না। কী হচ্ছে সেটাই ছিল মুখ্য। আমি এখনও বুঝতে পারি না, সরকারের দিক থেকে কেন এটা বলা এত জরুরি যে, কোন আইনে তারা সেনাবাহিনীকে মোতায়েন করেছে। এর জন্য তো সংসদ আর আদালত আছেই। তবে আইনও আছে। কোন আইন সেটা বলবে আদালত।"

জনাব মূসা আমার এই বক্তব্যের 'তখন আইনটা মুখ্য ব্যাপার ছিল না, কী হচ্ছে সেটাই মুখ্য' এবং 'তবে আইন আছে' এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ বাক্য বাদ দিয়ে মাঝখানের বাক্যগুলো উদ্ধৃত করে তাঁর লেখা শুরু করেছেন এবং বলেছেন— 'কথাটা কেমন ঘোরালো অথবা বিভ্রান্তিকর মনে হচ্ছে।' হ্যাঁ, এভাবে খণ্ডিত করে কারো বক্তব্য উদ্ধৃত করলে বিভ্রান্তিকরই মনে হবে। নিজের সৃষ্ট সেই বিভ্রান্তি থেকে বের হতে তিনি আমার বক্তব্যের যে-বিশ্লেষণ দিয়েছেন তার মূল উদ্দেশ্য ছিল আমাকে সরকারের কোলে ঠেলে দেয়া। সেসঙ্গে তিনি একটা বাজে খোঁচাও দিয়েছেন আমাকে।

যাক, এ-ব্যাপারে আমার ব্যাখ্যা হলো, ওই আলোচনায় আমি বক্তব্য রেখেছি একেবারে শেষ পর্যায়ে। অন্যদের আলোচনার সূত্র ধরে আমাকে বক্তব্য রাখতে হয়েছে। বক্তব্যের সেই পর্যায়ে আমার মনে হয়েছে, কোন আইনে সেনাবাহিনী নামানো হয়েছে সে-তর্ক আগে হয়েছে এবং এখন অপ্রয়োজনীয়। কারণ আমরা সবাই জানি (অন্তত যাঁরা আলোচনায় ছিলেন এবং আশা করি মূসা সাহেবও) এইড টু দ্য সিভিল পাওয়ার-এর আওতায় সেনাবাহিনী নামানো হয়েছে। সামরিক অভ্যুত্থান বা সামরিক শাসনের বাইরে সব সরকারের আমলেই ট্রাফিক কন্ট্রোল থেকে শুরু করে নানা কাজে সেনাবাহিনী নামানো হয়েছে একই আইনের আওতায়। সরকারের কয়েকজন মন্ত্রীকেও টিভি চ্যানেলগুলোর সিভিল এইড-এ সেনা নামানোর কথা বলতে শুনেছি। আমি গুরুত্ব দিতে চেয়েছিলাম এবং এখনও চাই, সেনা মোতায়েনের পর কী হচ্ছে (এখন বলতে হবে হয়েছে), তারা কী করেছে? তারা কি যথাযথ কর্তৃত্ব অনুসরণ করেছে? তারা কি আইনের আওতায় কাজ করেছে না আইনবহির্ভূত কিছু করছে? তাদের আচরণ পেশাদারিত্ব ও শৃঙ্খলার পরিপন্থি হচ্ছে কি না? হলে সেটার প্রতিকারের যে-আইন আছে সে মতো ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে কি না ইত্যাদি এবং গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনার বিষয়ও ছিল তা।

এবার আসি সংসদ বা আদালত প্রসঙ্গে। সংসদে বিরোধীদল সরকারের কাছে জনগণের পক্ষ থেকে জবাব চাইবে। সেরকম অনুকূল পরিস্থিতি না থাকলে আসে আদালতের প্রসঙ্গ। একটা উদাহরণ দিই। মনে করুন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কেউ আপনাকে আটক করতে এল। সেটা রাস্তায় বা বাড়িতে যেখানেই হোক। আপনি তার কাছে জানতে চাইবেন কেন আমাকে অ্যারেস্ট করছ। ওয়ারেন্ট আছে কি না ইত্যাদি। অর্থাৎ আপনি জানতে চাচ্ছেন কোন আইনে আমাকে ধরছ তুমি? মানে, আপনি মনে করছেন আপনাকে আটকানোটা বেআইনি। সে-জবাব যদি আপনি না পান, আপনাকে যদি আটক করেই ফেলে, আপনি কী করেন? নিশ্চয় আদালতে যান। আদালত আটকের কারণ জানতে চেয়ে রুল জারি করে বা আটক অবৈধ মনে হলে আপনাকে ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়। আমিও ঠিক এই পর্যায়ে এসে মানে আপনি যদি মনে করেন সেনাবাহিনী মোতায়েনের আইন সম্পর্কে সরকার আপনাকে জানাচ্ছে না এবং আপনি যদি এও মনে করেন সেটা বেআইনি, তা হলে আদালত আছে। যে-কেউ যেতে পারেন।

আদালত যদি মনে করে, এটা আইনগত কর্তৃত্ব-বহির্ভূত হয়েছে, তা হলে যারা সেনা মোতায়েন করেছে আদালত তাদের বলবে এটা বেআইনি। আশা করি, বিষয়টির ব্যাখ্যা আমি দিতে পেরেছি।

এ-প্রসঙ্গে বলি, শুধু সরকার কেন, একজন জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট যদি মনে করেন বিশেষ কোনো পরিস্থিতি তিনি পুলিশ বা অন্যদের দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না, তা-হলে সেই ম্যাজিস্ট্রেট-সংশ্লিষ্ট এলাকার সেনানিবাসের প্রধানকে সেনা মোতায়েনের জন্য বলতে পারেন। ওই সেনা কমান্ডার ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ পালন করতে বাধ্য। তবে এর জন্য শুধু তাঁর ঊর্ধ্বতন সেনা কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি অবহিত করতে হবে এবং তাও করবেন তিনি মানে সেনা কমান্ডারই। ম্যাজিস্ট্রেট জানাবেন সরকারকে।

এবার দ্বিতীয় বিষয়ে আসি। "আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটলে সব দেশেই সেনাবাহিনী নামানো হয় এক্সট্রা জুডিশিয়াল ব্যবস্থায়।" আগেই বলে নিই, আমি বলেছি 'কোনো কোনো দেশে', সব দেশে না। আমার তার পরের বাক্য ছিল, "আল্লাহর অশেষ রহমত, বাংলাদেশে এসব হচ্ছে না।" সেটা পত্রিকায় আসে নি। তো, এই বক্তব্য ধরে মূসা সাহেব বলেছেন, আমার বক্তব্য পরিষ্কার না। বরং জটিল এবং আইন-আদালত-সম্পর্কিত আগের বক্তব্যের পরিপন্থি এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা বা মৌলিক অধিকার হরণের পক্ষে সাফাই। তারপর তিনি লিখেছেন, 'এক্সট্রা জুডিশিয়াল' অর্থ জানার জন্য তিনি আইনজ্ঞ সংবিধান বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং ভয়ঙ্কর-সাংঘাতিক পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে, এমন আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন।

কিন্তু আমার ওই কথার ব্যাখ্যা আমার বক্তব্যেই ছিল। আমার সেই বক্তব্য এখানে হুবহু তুলে ধরছি পাঠকদের জন্য।

"আমি যখন ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্রদূত ছিলাম তখন একবার ইন্দোনেশিয়ায় গোয়েন্দা সংস্থার এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমরা যে সন্ত্রাসীদের গুমখুন শুরু করেছ, এক্সট্রা-জুডিশিয়াল ব্যবস্থা নিয়েছ—এটা কেন? ওরা বলেছিল, জামিন পাওয়ার পর এরা আরো বেশি ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। মামলা চালাতেও তো টাকা লাগবে। অন্তত এই টাকা পাওয়ার জন্যও তো সন্ত্রাস করবে তারা। এজন্য আমি বলব, দুর্নীতি আর সন্ত্রাস যমজ ভাই। কিন্তু রাস্তার সন্ত্রাস দমন করাটাকে আমার কাছে খুব সমস্যার ব্যাপার মনে হয় না। হোয়াইট কলার সন্ত্রাস, অভিজাত সন্ত্রাস আরও ভয়ঙ্কর। এই সন্ত্রাস পুরো দেশকে ধ্বংস করছে। যারা স্যুট পরে সন্ত্রাস করছে তারা তো দেশের মেরুদণ্ড ভেঙে দিচ্ছে।"

এবার আসুন এক্সট্রা জুডিশিয়াল মেজার্স সম্পর্কে। এর অর্থ বোঝার জন্য সংবিধান বিশেষজ্ঞের দরকার হয় না। এর সোজাসুজি অর্থ হলো সামরিক-বেসামরিক আইন-আদালত ও নৈতিকতার বাইরের কোনো কাজ। আরও সহজ কথায় আইন প্রয়োগকারীদের মাধ্যমে খুন-খারাবি করানো, গুম করে দেয়া ও এর দায়দায়িত্ব অস্বীকার করা। মোটকথা এক্সট্রা জুডিশিয়াল বললেই আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে খুন, গুম ইত্যাদি।

আমার আরেকটা বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন এবিএম মূসা। "সিভিল কোর্টে যদি এসব মামলা নিয়ে যান তাহলে একটিও টিকবে না। কিন্তু সামরিক আদালতে গেলে সেনা আইনের সেকশন ৩৪ ও ৫৫-এর আওতায় পাঁচ বছরের জেল হয়ে যাবে। কোনো আপিল হবে না।" এই বক্তব্য কোট করে তিনি বলেছেন, "মাথার মধ্যে কেমন যেন জট পাকিয়ে গেছে। বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারলে জেনারেল মইনের কাছ থেকে বিষয়টি বুঝে নিতে পারতাম।"

বোঝেননি বলে তারপরও তিনি এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং তা আমার ঘাড়ে বন্দুক রেখে। শুনুন তিনি কী বলেছেন, 'হয়তো তিনি (মানে আমি) ভিন্নার্থে কথাটি বলেছেন, সেনাবাহিনীর কার্যক্রম যে সিভিলিয়ান আইানের আওতার বাইরে, এমনটি পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন।" বুঝুন এবার, যিনি নিজেই বোঝেন নি বলে বলেছেন, তিনিই আবার মনগড়া একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছেন। তারপর বললেন, মাথায় জট লেগে গেছে।

জনাব মূসাকে বলছি, এর একটা ব্যাখ্যা আমার বক্তব্যেই ছিল। আপনি সেটার কথা তোলেন নি। কারণ তা হলে তো আর জট পাকানো সম্ভব হবে না। ব্যাখ্যাটি আবার উদ্ধৃত করলাম।

"হেফাজতে মৃত্যুর ক্ষেত্রেও সেনাবাহিনীতে আইন আছে। তবে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৩২ ধারার মাধ্যমে সেনাবাহিনীকে তাদের কার্যাদির ব্যাপারে নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে। সেনাবাহিনীকে তো আর আদলতে নেয়া যায় না। কিন্তু কয়েদিদের সঠিক যত্ন নেয়ার দায়িত্ব তাদের পালন করতে হবে। সেনা আইনের ৩৪ ধারায় কর্তব্যে অবহেলা, আর ৫৫ ধারায় অসদাচরণের বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করা

হয়েছে। এগুলো ভঙ্গের অভিযোগে কোনো জোয়ানকে, যদি তিনি অফিসার না হন, এক ঘণ্টার মধ্যে পাঁচ বছরের জন্য কারাদণ্ড দেয়ার বিধান আছে। এই আইনগুলো মানা হচ্ছে কি না সেনাবাহিনীর কাছে সেটাই আমার প্রশ্ন। না করা হলে কেন এগুলো বলা হয় না। আইনগুলো মেনে চলা হলে কোর্ট মার্শাল খুবই গণতান্ত্রিক। আপনাদের বলতে চাই, সব কোর্ট মার্শালই কিন্তু সাধারণ মানুষের অভিযোগের মাধ্যমে দায়ের করা হয়, যদিও সেনাবাহিনীই তার বিচার করে। সেনাবাহিনী তো এ দেশেরই সংস্থা।"

আরও ব্যাখ্যা এখানে দিচ্ছি, সিআরপিসি, এমবিএমএল, ইনসট্রাকশন রিগার্ডিং এইড টু দ্য সিভিল পাওয়ার—এসব বাংলাদেশ সরকারেরই আইন ও আদেশ। এগুলো গোপনীয় দলিল নয় যে কেউ পড়তে চাইলে পাবেন না। তো সিআরপিসির ১৩২ ধারায় বলা আছে, অভিযানের সময় কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলে (আহত, নিহত ইত্যাদি) সামরিক বাহিনীর সদস্যরাই কেবল নয়, পুলিশ এবং ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধেও ফৌজদারি আদালতে মামলা শুরু করা যাবে না, যতক্ষণ না সরকার অনুমতি দেয়। অর্থাৎ যৌথবাহিনীর সবাইকে এই কার্যে নিয়োজিত সময়ের জন্য প্রটেকশন দেয়া হয়েছে ফৌজদারি আদালতের জন্য। কিন্তু সামরিক বাহিনীর সদস্যদের অধিনায়কগণ গাফিলতি, বাড়াবাড়ি বা অনাচারের জন্য ইচ্ছা করলেই সহজে কোর্ট মার্শাল করতে পারেন আর্মি অ্যাক্টের ৩৪ ও ৫৫ ধারায়। এর জন্য সরকারের আলাদা বা বিশেষ কোনো অনুমোদনের দরকার পড়ে না। ইচ্ছা করলে সামরিক বাহিনী প্রকাশ্যেও কোর্ট মার্শাল করতে পারে। সামরিক আইনে বাধা নেই। আমি আমার বক্তব্যে লে. কর্নেল নূরন্নবীর কোর্ট মার্শালের উদাহরণও দিয়েছিলাম। আমি তখন সেনাবাহিনীর অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল (১৯৮১ সালে)। অন্যান্য দায়িত্বের মতো শৃঙ্খলা কোর্ট মার্শাল ইত্যাদি অ্যাডজুটেন্ট জেনারেলের দপ্তরের অধীনে হয়। যদিও *প্রথম আলোর* ক্রোড়পত্রে লেখাটা এমনভাবে এসেছে, যেন আমারও কোর্ট মার্শাল হয়েছিল তখন।

যা ই হোক, জনাব মূসা তাঁর লেখা শেষও করেছেন আমার বক্তব্য উদ্ধৃত করে। আমার বক্তব্যটা ছিল এমন—"হঠকারীভাবে আমরা যেন এমন কিছু না বলি যাতে আমাদের সেনাবাহিনীর মনোবল ভেঙে যেতে পারে। এটা আমার অনুরোধ এখন বলতে হয়, সে-অনুরোধ রক্ষিত হয় নি। হঠকারিতা হয়েছে। তবে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কি না জানি না। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে যে হয়েছে তার প্রমাণ জনাব মূসার লেখা।

সর্বশেষে বলি, জনাব মূসা আক্ষেপ করেছেন, বৈঠকে উপস্থিত থাকলে তিনি সব বুঝতে পারতেন। আমিও তাঁর সঙ্গে একমত।

*প্রথম আলো* ১৫ জানুয়ারি ২০০৩

# 'অকার্যকর রাষ্ট্র' নিয়ে কার্যকর আলোচনা!

'যিশুখ্রিস্ট কেন মারা গিয়েছিলেন' এই ছিল টাইম ম্যাগাজিনের ১২ এপ্রিল সংখ্যার প্রচ্ছদ প্রতিবেদন। যে-কোনো ধর্মের আগ্রহী পাঠক লেখাটা পড়তে চাইতে পারেন। টাইমের ওই সংখ্যারই ২০-এর পাতায় বাংলাদেশ নিয়ে একটি প্রতিবেদন লিখেছেন সাংবাদিক অরবিন্দ আদিগা। সেটাও এক অর্থে বাংলাদেশের সম্ভাব্য মৃত্যুর খবর। প্রতিবেদনটিতে বাংলাদেশকে বলা হয়েছে এশিয়ার সবচেয়ে অকার্যকর রাষ্ট্র! তার মানে দাঁড়ায়, বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি আফগানিস্তানের চেয়েও খারাপ!

২৭ মে *প্রথম আলোর* সম্পাদক মতিউর রহমান 'বাংলাদেশ কি একটি অকার্যকর রাষ্ট্র?' এই শিরোনামে একটি মন্তব্য প্রতিবেদন লেখেন। এই লেখা প্রকাশের পর সচেতন মহলে বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়। প্রথম আলোসহ বিভিন্ন পত্রিকায় এ নিয়ে লেখালেখি হয়েছে, হচ্ছে এবং আরও হবে বলে মনে হচ্ছে। আমিও বার্তাসংস্থা বাসসকে এ-বিষয়ে একটি ছোট সাক্ষাৎকার দিয়েছি, যা বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপাও হয়। এরপর প্রথম আলো সম্পাদক আমাকে বিষয়টি নিয়ে আরেকটু বিস্তারিত লিখতে অনুরোধ করেন।

ফিরে আসি অরবিন্দ আদিগার প্রতিবেদনে। ওই প্রতিবেদনে সন্ত্রাস, দুর্নীতি, মৌলবাদ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, আইন-শৃঙ্খলা ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করে বাংলাদেশকে এশিয়ার সবচেয়ে অকার্যকর রাষ্ট্র বলে অভিহিত করা হয়। বলা বাহুল্য, একজন সাংবাদিক হিসেবে তিনি এসব কারণে বাংলাদেশ সরকারকে সমালোচনা করতে পারতেন এবং সেটাই হতো সঙ্গত। কিন্তু একটি রাষ্ট্র ও জাতিকে কেন তিনি হঠাৎ করে এসব ব্যর্থতার জন্য দায়ী করে রাষ্ট্রটির অস্তিত্ব টিকে থাকার বিষয়টি সামনে নিয়ে এসেছেন তা আশঙ্কা ও চিন্তার বিষয়। তবে বিবেকের স্ফুলিঙ্গ ও চোখ-কান খোলা থাকলে এই 'কেন'র উত্তর পাওয়া খুব দুরূহ নয়। বিশেষ করে বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণে এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিয়ে দিশেহারা বিশ্বের একক পরাশক্তি আমেরিকার সরকারগুলো নিজেদের পিঠ

বাঁচানোর জন্য নানা তত্ত্বের আবরণে বেপরোয়া সব কর্মকাণ্ড করছে এবং ভবিষ্যতেও করতে দ্বিধাবোধ করবে না। অরবিন্দ আদিগা এরকম এক সাম্প্রতিক মার্কিন তত্ত্বের ফেরে ফেলে বাংলাদেশকে অকার্যকর রাষ্ট্র বলে চিহ্নিত করার (অপ) প্রয়াস নিয়েছেন। প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশ সরকার এসব অপপ্রচার মোকাবিলা করার জন্য কী প্রস্তুতি নিয়েছে বা তারা আদৌ এই প্রক্রিয়াগুলো সম্পর্কে সচেতন কি না। এর দুটি উত্তর হতে পারে। প্রথমত, অকার্যকর রাষ্ট্রের কারণ হিসেবে যেসব বিষয় আলোচনায় এসেছে, মানে দেশের ভেতরে আইন-শৃঙ্খলা, জননিরাপত্তা, দুর্নীতি ইত্যাদি নিয়ে কিছু বলার নৈতিক জোর সরকার পাচ্ছে না। দ্বিতীয়ত, সরকারের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে দেশের ভেতরে জনগণের সচেতন অংশের সব সমালোচনা যেমন তাঁরা আমলে নিচ্ছেন না, এ-বিষয়েও কি সে-নীতিই নিয়েছেন তাঁরা? বলা বাহুল্য, দুটোই ভুল এবং তা দেশ পরিচালনাক্ষেত্রে ভুলের সঙ্গে মিলে দেশের ভাবমূর্তির আরও ক্ষতিই ত্বরান্বিত করবে।

এবার আসুন অরবিন্দ আদিগা বাংলাদেশকে কোন তত্ত্বের ফেরে ফেলেছেন সেটা দেখা যাক। যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের আমলে সিআইএর একটি প্রতিবেদনে বিশ্বের ৩৩টি দেশকে 'দুর্বল' রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। তবে তাতে বাংলাদেশের নাম ছিল না। মূলত তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট আল গোরের নির্দেশে সিআইএ ওই কাজ শুরু করে। সিআইএর ওই কমিটির নাম ছিল 'স্টেট ফেইলিওর টাস্কফোর্স'। ওই কমিটি ১১৩ কেস স্টাডি থেকে ৬০০ ফ্যাক্টর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিল। শতকরা ৭০ ভাগ কেস স্টাডিতে তারা ৩১টি সাধারণ নিয়ামক (কমন ভেরিয়েবল) চিহ্নিত করে, যেগুলোর মাধ্যমে কোনো সরকারের গুরুতর ব্যর্থতা আগাম নিরূপণ করা সম্ভব। ১৯৯৫ সালে এই কমিটি সরকারকে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দেয়। একটা সরকারের দুর্বলতা নিরূপণকারী নিয়ামকগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো গণতন্ত্রের মাত্রা, অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ, যুবগোষ্ঠীর বেকারত্ব, দুর্নীতি, আইন-শৃঙ্খলা, গণহত্যা, বিপ্লব, জাতিগত সংঘাত, সহিংস উপায়ে রাজনৈতিক ক্ষমতার পট পরিবর্তন ইত্যাদি।

এর ভিত্তিতে মার্কিন প্রশাসন তাদের বা তাদের মিত্রদেশের জন্য অর্থনৈতিক বা রাষ্ট্রিক নিরাপত্তার হুমকি ও স্বার্থের পরিপন্থি হতে পারে এমন কিছু রাষ্ট্রকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করে ১. দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র (Rouge State) লিবিয়া, ইরান, ইরাক, উত্তর কোরিয়া। ২. অকার্যকর রাষ্ট্র (Disfunctional State) সোমালিয়া, বুরুন্ডি, রুয়ান্ডা ও বসনিয়া ইত্যাদি। ৩. ব্যর্থ রাষ্ট্র (Failed State) আফগানিস্তান।

১১ সেপ্টেম্বরের হামলার পর আমেরিকা আল-কায়েদা ও ওসামা বিন লাদেনকে শায়েস্তা করার নাম করে তাদের চিহ্নিত তালেবান-শাসিত 'ব্যর্থ রাষ্ট্র' আফগানিস্তানকে আক্রমণ করে। এর পরই তারা ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র রাখার ভিত্তিহীন অভিযোগ প্রচার করে 'দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র' ইরাকেও হামলা চালায়। দুটি দেশেই

এখন তারা তাদের পছন্দের সরকার বসিয়েছে। এতে প্রমাণিত হয়, নিজেদের স্বার্থে মার্কিনিরা সময়ে সময়ে এই রাষ্ট্রগুলোকে একটা 'মর্যাদা' দেয়, আবার তারাই সেটা বদলায়। যেমন, একই সময়ে লিবিয়াকে তারা আগের তালিকা থেকে কার্যত বাদ রেখেছে। রোমান দার্শনিক টেসিটাসের কথায়, "দ্য সিক্রেট অব এমপায়ার ওয়াজ আউট-অ্যান এমপেরর কুড বি মেইড এলস্‌হয়ার দ্য ইন রোম।' এর আমেরিকান সংস্করণ হতে পারে, 'প্রেসিডেন্ট/প্রাইম মিনিস্টার ক্যান বি মেইড আদারওয়াইজ দ্যন বাই এ জেনারেল ইলেকশন ইন দ্য কান্ট্রি।' মূলত আমেরিকানদের এই নীতিরই মাঠ-পরীক্ষা চলছে আফগানিস্তান ও ইরাকে।

এদিকে প্রখ্যাত মার্কিন লেখক ল্যারি পি গুডসনের 'আফগানিস্তানস এন্ডলেস ওয়ার, স্টেট ফেইলিওর, রিজিওনাল পলিটিক্স অ্যান্ড রাইজ অব দা তালিবান' বইতে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কাকে উল্লেখ করা হয়েছে সম্ভাব্য ব্যর্থ হিসেবে। স্বাতন্ত্র্যসূচক রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, জনমিতিক ও ভৌগোলিক কারণে এই দেশগুলোতে রাষ্ট্র ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে লেখক ল্যারি গুডসনের মনে হয়েছে। তবে সুখের বিষয়, গুডসনের এই 'সম্ভাব্য ব্যর্থ রাষ্ট্রগুলো'র তালিকায়ও বাংলাদেশের নাম নেই।

এ-অবস্থায় *প্রথম আলো* সম্পাদকের লেখার সূত্রে যে-বিতর্ক বা আলোচনা শুরু হয়েছে তাতে দেশে অনেকে উদ্বিগ্ন হচ্ছেন। মতিউর রহমান প্রশ্ন রেখেছেন, বাংলাদেশ কি একটি অকার্যকর রাষ্ট্র? তবে তাঁর লেখার ভেতরে অকার্যকর রাষ্ট্র নিয়ে কোনো কথা ছিল না। ছিল সরকারের অব্যাহত ব্যর্থতার নানা চিত্র। ব্যর্থতার সে-উদাহরণগুলো তথা আইন-শৃঙ্খলা, দুর্নীতির লাগামহীনতা সিআইএ-নির্ধারিত ৩১টি নিয়ামকের মধ্যে পড়ে এবং পড়ার কথাও। এ-অবস্থায় তাঁর উচিত ছিল এমন প্রশ্ন তোলা সরকার কি অকার্যকর হয়ে পড়ছে? উচিত ছিল জাতি ও দেশের স্বার্থে সরকার ও রাষ্ট্রকে তাদের স্বনির্ধারিত আলাদা অবস্থানে রাখা।

রাষ্ট্র হচ্ছে একটি জাতির রাজনৈতিক সত্তা (পলিটিক্যাল এনটিটি), আর সরকার হচ্ছে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি যারা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রাষ্ট্র পরিচালনা করে। রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত এই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ব্যর্থতা সরকারেরই ব্যর্থতা। এটা জাতি কিংবা রাষ্ট্রের ব্যর্থতা হতে পারে না। একটি রাষ্ট্র অকার্যকর বা ব্যর্থ হলে জাতির অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়ে। কিন্তু জাতি হিসেবে এমন হুমকির মুখে আমরা নেই। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশ কখনই অভ্যন্তরীণ বা বহিঃশত্রুর বড় কোনো হুমকির মুখে পড়ে নি। একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে গত ৩২ বছরে আমরা অনেকটা অগ্রগতি লাভ করেছি। এ-সময়কালে আমাদের পক্ষে যা অর্জন করা সম্ভব ছিল তা অর্জন করতে পারি নি—এটা আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সরকারগুলোর ব্যর্থতা।

রাষ্ট্রের কাজ সম্পাদিত হয় সরকারের মাধ্যমে। আর সে-কারণেই সরকারের শাসনপ্রক্রিয়ার সমালোচনা করা যেতে পারে, তবে নিজ রাষ্ট্রের সমালোচনা নয়।

একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র পরিচালনা করার জন্য যতগুলো প্রতিষ্ঠান কাজ করে বাংলাদেশে তার সবগুলোই পুরোপুরি ক্রিয়াশীল আছে। বাংলাদেশে একটি এককেন্দ্রিক সরকার, একটি সার্বভৌম পার্লামেন্ট ও জনগণের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ আছে। আমদের একটি পররাষ্ট্রনীতি ও বৈদেশিক আদান-প্রদান আছে। সমস্যা হলো আমাদের সরকারের সুশাসনে। তাঁরা নিয়মনীতির ভিত্তিতে দেশ চালাতে অপারগতা দেখাচ্ছেন। তাঁদের দেশ পরিচালনার গুণগত মান নিয়ে জনগণের অভিযোগ রয়েছে এবং সরকারের ওপর জনগণের আস্থার অভাব দেখা যায়। এসব সীমাবদ্ধতাকে রাষ্ট্র বা জাতির ব্যর্থতা বলে কখনই প্রতিপন্ন করা যায় না।

আমেরিকান নীতিতে অকার্যকর রাষ্ট্র হচ্ছে সেসব দেশ, যারা নিজেদের নাগরিকদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ কিংবা দেশের সীমানা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং দেশের নাগরিকদের চোখে যেসব রাষ্ট্র দুর্নীতিগ্রস্ত ও অবৈধ। এসব দেশ জাতিসংঘের সদস্য হিসেবে টিকে থাকতে পারবে কিন্তু নিজেরা নিজেদের শাসন করতে পারবে না। মার্কিন কর্তৃপক্ষ মনে করে, এ-রাষ্ট্রগুলো নিজেদের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ হারালে যুক্তরাষ্ট্রকেই তার জন্য মূল্য দিতে হয়। ফলে এসব দেশকে টিকিয়ে রাখা বাতুলতা। বর্তমান মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির মূল বিষয় হলো—এসব রাষ্ট্রে মার্কিন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

তারা আরও মনে করে, কোনো দেশ যদি অভ্যন্তরীণ নিপীড়ন, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কারণে অকার্যকর হয়ে পড়ে বা সেদেশের সরকার জনগণের দুর্দশা লাঘবে ব্যর্থ হয় তা হলে সেদেশের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক দায়দায়িত্ব নিতে হবে। এর মানে জাতিসংঘের নেতৃত্বে 'ব্লু হেলমেট ফোর্স' সেখানে উপস্থিত হবে। যেমনটি হচ্ছে জাতিগত সংঘাত, গণহত্যা ও আইন-শৃঙ্খলার মারাত্মক অবনতির কারণে রাষ্ট্রব্যবস্থা ভেঙে-পড়া সাবসাহারা-আফ্রিকা মহাদেশের সিয়েরা লিওন, সোমালিয়া, রুয়ান্ডা, কঙ্গো ইত্যাদি দেশে।

বাংলাদেশের বর্তমান যে-অবস্থা তাতে নাগরিক হিসেবে হতাশার যথেষ্ট কারণ আমাদের আছে। দেশ পরিচালনায় সরকারগুলোর উপর্যুপরি ব্যর্থতার কারণে সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। এই অস্থিরতা ও সুশাসনের অনুপস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে এখন পুরো জাতিকে ও রাষ্ট্রকে এর মধ্যে টেনে নামানো হচ্ছে। এতে বাইরে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরও হেয় হচ্ছে। কথা হচ্ছে, আমরা এমন কিছু করব না যাতে বাংলাদেশ আমেরিকার 'কমিশন অন উইক স্টেট অ্যান্ড ন্যাশনাল সিকিউরিটি'র খপ্পরে পড়ে। আমাদের যা করতে হবে তা হলো রাষ্ট্র ও সরকারের আলাদা অস্তিত্ব জানান দেয়া এবং যার দোষ তার ঘাড়ে চাপানো। কারও কারণে রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হবে এটা মেনে নেয়া যায় না।

ভারতের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও গত বিজেপি সরকারের অর্থমন্ত্রী যশবন্ত সিং বিষ্ণু গুপ্তকে (যার অপবাদসূচক নাম চাণক্য, কৌটিল্য) উদ্ধৃত করে বলেছেন,

সরাসরি যুদ্ধ না করে কোনো দেশকে বশে বা অনুগত রাখার কৌশল হলো মনস্তাত্ত্বিক কিংবা 'সাবভার্সিব' কাজকর্ম চালু রাখা। কারণ সেটা সহিংস ও ব্যয়বহুল নয় (লান্সার পেপার-৭, ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যান্ড আউটলাইন অব আওয়ার কনসার্নস, ১৯৯৬)। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ, ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা এমআই-৬ এবং ভারতীয় ও অন্যান্য দেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো উদ্দিষ্ট দেশে গোপনে নানা নোংরা কৌশলে (ডার্টি ট্রিক্স) বিভিন্ন রূপে কাজ করে। তার মধ্যে আছে অনুদান (সরকারি ও এনজিও পর্যায়ে), ঘুষ, গুপ্তহত্যা, অস্থিরতা সৃষ্টি, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াকে প্রলুব্ধ বা প্রভাবিত করে উদ্দিষ্ট দেশের পক্ষে বা বিপক্ষে প্রচারণা চালানো। বাংলাদেশ নিয়ে টাইম ম্যাগাজিনে প্রকাশিত অরবিন্দর ওই প্রতিবেদন তাই আমাদের শঙ্কিত করে। দেশের ভেতরে এ-ধরনের লেখালেখির সময় জাতি ও দেশের স্বার্থে বিষয়টি দায়িত্বশীল নাগরিকদের মনে রাখা জরুরি।

*প্রথম আলো* ২০ জুলাই ২০০৪

# ধীরে ধীরে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা হয়

বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য যে, স্বাধীনতালাভের চার বছরের মধ্যেই স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী অন্য চারজন শীর্ষ নেতাকে সে হারাল। জীবনের শেষ লগ্নে এসে একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং সার্বক্ষণিক পেশাদার সৈনিক হিসেবে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট, ৩ নভেম্বর ও ৭ নভেম্বরের ঘটনাগুলো নিয়ে ৩০ বছর পর যখন ভাবতে বসি, তখন মনে হয়, এই রক্তাক্ত নৃশংসতা না ঘটলে দেশের পরিস্থিতি হয়তো ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতো তথা রাজনৈতিক ধারাবাহিকতা ও স্থিতিশীলতায় ঘাটতি থাকত না, যেটা এখন পরিলক্ষিত হচ্ছে। আমি শুধু ওই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীই নই, তৎকালীন একজন সিনিয়র অফিসার হিসেবে সেনাবাহিনীর সদরদপ্তরে অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেলের (প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার) দায়িত্ব পালন করছিলাম।

আমার মতে, ১৫ আগস্টের ঘটনা না ঘটলে ৩ নভেম্বর ও ৭ নভেম্বরের ঘটনা না ঘটারই সম্ভাবনা বেশি ছিল। দুর্ভাগ্য, আমরা এই তিন ঘটনার সময় দেশকে ধ্বংসের দুয়ার পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিলাম। এ-ঘটনাবলি আমাদের দেশের ইতিহাসে একটি দুঃখজনক অধ্যায়। সেনা সংস্কৃতি ও সেনাবাহিনীর নৈতিক ভিত্তি হচ্ছে ইস্পাতকঠিন শৃঙ্খলা। এই শৃঙ্খলার অবক্ষয়ের প্রতিফলন হলো সামরিক অভ্যুত্থান, বিদ্রোহ, দুর্বল অধিনায়কত্ব এবং সেনাবাহিনীতে রাজনীতির প্রভাব ও সেনাবাহিনীকে রাজনীতিকরণ, যেটা কখনই কাম্য নয়। সেনাবাহিনীকে তাদের পেশাদার দায়িত্ব থেকে সরিয়ে এনে রাজনৈতিক কার্যকলাপে সম্পৃক্ত করলে তা হয়ে ওঠে আগুন নিয়ে খেলার মতো। একটি কথা আমি আমাদের রাজনীতিবিদদের বলতে চাই, যদিও দেশের সামরিক বাহিনী একটি অজনপ্রিয় সরকারকে ক্ষমতায় রাখতে সাহায্য করে না, কিন্তু তারা তাদের ক্ষমতাচ্যুত করতে সহায়ক হতে পারে। আমাদের দেশেও এরকম উদাহরণ আছে।

১৫ আগস্টের ঘটনা নিয়ে অনেক গবেষণা, লেখালেখি হয়েছে, ফলে সেটা নিয়ে বেশি কথা বলব না। শুধু বলি, সেনাবাহিনীর কয়েকজন জুনিয়র অফিসার

কিছু সৈনিককে বিপথগামী করে ১৫ আগস্টের নৃশংস ও মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটিয়েছিল। ৩ মাস পরেই ৩ নভেম্বর আবার যে-ঘটনাটি ঘটানো হয়, সেটিও সাধারণ সৈনিকদের সরাসরি সমর্থন ছাড়াই। কিছুসংখ্যক সামরিক কর্মকর্তা তৎকালীন সেনাপ্রধানকে গৃহবন্দি করে ক্ষমতাদখলের চেষ্টা চালায়। ১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বরের ঘটনাবলির কারণে সেনাবাহিনীর কমান্ড ও কন্ট্রোলের যে-অভাব দেখা দেয় (প্রকৃতপক্ষে তখন চেইন অব কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল ভেঙে পড়েছিল) এবং সেনাবাহিনীর প্রধানকে ক্যান্টনমেন্টে বন্দি করা নিয়ে যে-বিশৃঙ্খলার শুরু, পরে তাঁর কাছ থেকে জোর করে ইস্তফা আদায় করার মাধ্যমে যে-অনিশ্চয়তা ও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, তা শুধু সেনানিবাসেই সীমিত থাকেনি, তা সেনানিবাসের বাইরেও ছড়িয়ে যায় এবং নানা ধরনের গুজব ও অনাকাঙ্ক্ষিত কথাবার্তা পুরো দেশকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তার ফলে দেশের প্রশাসনে ও সর্বক্ষেত্রে একটা শূন্যতা সৃষ্টি হয়। এই সুযোগে কিছুসংখ্যক সাবেক সৈনিক ও অফিসার এবং সেনাবাহিনীর গুটিকয়েক নিম্নপদস্থ সদস্য দিয়ে সামরিক বাহিনীর অফিসারদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের উস্কানিমূলক লিফলেট শহরে এবং সেনানিবাসগুলোয় ছড়িয়ে দেয়া হয়। লিফলেটগুলো বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার নামে ছাপানো হয়। তাদের এই লিফলেটের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলোর মধ্যে লেখা ছিল, বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর অফিসাররা নিজের স্বার্থে সৈনিকদের ব্যবহার করে যাচ্ছে। তাই বাংলাদেশ সেনাবাহিনী হবে অফিসারবিহীন এবং সৈনিকরা বিপ্লবী কাউন্সিলের মাধ্যমে সেনাবাহিনী চালাবে। অন্যান্য দাবির মধ্যে ছিল তাদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি এবং ব্যাটম্যান/অর্ডারলি প্রথা বিলোপ ইত্যাদি।

এই লিফলেট সেনানিবাসগুলোয় ব্যাপকভাবে বিলি করা হয়। এই লিফলেট এবং প্রচারণার সঙ্গে অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল তাহের ও স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন কিছু সাবেক সৈনিক যুক্ত ছিলেন। এই লিফলেট বিতরণের আগে থেকেই অর্থাৎ ৩ নভেম্বরে সেনাপ্রধানকে বন্দি করার পর থেকেই বেশির ভাগ সৈনিক ও অফিসার অসন্তুষ্ট ছিলেন। একজন সেনাপ্রধানকে বন্দি করে তাঁর জুনিয়র একজন সেনা-অফিসার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সেনাপ্রধানের দায়িত্ব নেবেন, সেটা বেশির ভাগ সৈনিকই পছন্দ করেন নি। তার ওপর জেনারেল জিয়া সেনাবাহিনীতে খালেদ মোশাররফের চেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য ও জনপ্রিয় ছিলেন। সবকিছু মিলিয়েই দেশে তখন সরকারের উপস্থিতি ছিল না। তার ওপর প্রশাসনে এই শূন্যতা এবং উস্কানিমূলক লিফলেট সেনানিবাসে নাজুক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। কোনো-একটা বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে, সেনানিবাসে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ হতে পারে, এরকম সব ধরনের উপাদানই তখন বিদ্যমান ছিল।

৭ নভেম্বরের ঘটনা শুরু হয় রাত ১২টার পর। লক্ষ্যহীন বিক্ষিপ্ত গোলাগুলি প্রথম শুরু হয় বিমানবন্দর রাস্তার পাশে বিমানবিধ্বংসী ইউনিট, অর্ডন্যান্স ডিপো এবং গ্যারিসন মসজিদের পাশে সিগন্যাল ইউনিট থেকে। তারপর ইউনিট থেকে

সৈনিকদের কেউ সামরিক পোশাকে, কেউ বেসামরিক পোশাকে সিপাহি বিপ্লবের স্লোগান দিতে থাকে এবং ফাঁকা গুলি করতে করতে বেরিয়ে পড়ে। একপর্যায়ে শেষরাতের দিকে দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারির সুবেদার মেজর আনিসের নেতৃত্বে ৬০-৭০ জন সৈনিক কোনো বাধাবিপত্তি ছাড়াই গৃহবন্দি সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানের বাসায় প্রবেশ করে এবং তাঁকে কাঁধে উঠিয়ে তাঁর বাড়ির পাশেই দ্বিতীয় ফিল্ড রেজিমেন্টে নিয়ে যায়। তখনও চারদিকে গোলাগুলি চলছিল।

আমি একজন প্রত্যক্ষদর্শী এবং বিশেষ করে ৭ নভেম্বর সকালে আমিই প্রথম তথাকথিত বিপ্লবী সেনাদের নেতাদের নিয়ে ঢাকা সেনানিবাসের মিলনায়তনে ঘণ্টাখানেকেরও বেশি সময় ধরে কথা চালিয়ে যাই। তাদের এই বিশৃঙ্খলা ও হানাহানি থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা চালাই। এর কিছু পরেই তৎকালীন সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমান, যাঁকে সৈনিকরা মুক্ত করে নিয়ে এসেছিল, তিনি সৈনিকদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন এবং তাদের অফিসারদের নির্দেশ মেনে চলতে, ইউনিটে ফিরে যেতে এবং অস্ত্র জমা দিতে বলেন। এর আগেই ৭ নভেম্বর ভোরে তারা বেশ কয়েকজন সামরিক অফিসারকে হত্যা করেছিল। এর পরেও দুই-একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়; কিন্তু ধীরে ধীরে তাদের চেইন অব কমান্ডে ফিরিয়ে আনা হয়।

উপরে সংক্ষিপ্তভাবে যা বলা হলো তার উদ্দেশ্য কাউকে মহিমান্বিত করা বা কারও সমালোচনা করা নয়, শুধু ৭ নভেম্বরের ঘটনাবলির প্রকৃত ইতিহাস আগামী প্রজন্মের সামনে তুলে ধরা এবং যাতে ভবিষ্যতে আমাদের ইতিহাসবিদরা ঘটনাগুলোর সঠিক মূল্যায়ন করেন, তাতে সাহায্য করা। আমি নেপোলিয়নের একটি উক্তি দিয়ে লেখাটি শেষ করতে চাই, "হি হু সেইভ দ্য নেশন ভায়োলেটস নো ল"—যে দেশকে ধ্বংস ও বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচায়, সে কোনো আইন ভঙ্গকারী নয়।

*প্রথম আলো* ৭ নভেম্বর ২০০৫

# দায়মুক্তি নিয়ে আরও প্রশ্ন

যৌথ অভিযানের দায়মুক্তি অধ্যাদেশ অনুমোদন সংসদে স্থগিত হয়ে গেছে। কারণ হিসেবে আইনমন্ত্রী সংসদে বলেছেন, প্রস্তাবিত বিলে মুদ্রণক্রটি ধরা পড়েছে। ক্রটিটি কী তা অধিবেশনের পরে সাংবাদিকদের বলা হয়েছে। বিলের তৃতীয় ধারায় সামরিক-বেসামরিক সবরকম বিচারপ্রক্রিয়া থেকে অভিযানে সংশ্লিষ্ট শৃঙ্খলাবাহিনীর সদস্যদের দায়মুক্ত করার প্রস্তাব ছিল।

ক্রটির ব্যাখ্যায় জানা গেল, সরকার সামরিক বিচারপ্রক্রিয়া থেকে শৃঙ্খলাবাহিনীর সদস্যদের অব্যাহতি দেবে না। এটা স্বস্তিদায়ক খবর। কারণ দায়মুক্তি অধ্যাদেশ জারির প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে আমি গত ১০ জানুয়ারি প্রথম আলোয় অন্যান্য বক্তব্যের সঙ্গে প্রশ্ন রেখেছিলাম—সামরিক বাহিনীর নিজস্ব আইনি বিচারপ্রক্রিয়া থেকেও কি তারা রেহাই পাবে? যদি রেহাই দেয়া হয় তা হলে সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলায় নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

বর্তমান অবস্থায় মানুষের মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হচ্ছে যে, যৌথ অভিযান চলাকালে যাদের বিরুদ্ধে বেআইনি কর্মকাণ্ডের অভিযোগ উঠেছিল তাদের প্রমাণসাপেক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে সামরিক আদালতে কিংবা সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালতে (কোর্ট মার্শাল, সামরিক কোর্ট মার্শাল) বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। আশা করি, সামরিক বাহিনীতে এই প্রক্রিয়া চলছে।

কিন্তু এখানে বাংলাদেশ সেনা-আইনের কয়েকটি ধারার প্রতি আমি সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্রহেবিশন অব সেকেন্ড ট্রায়াল—এই শিরোনামে সেনা-আইনের ৯০ ধারায় বলা হয়েছে, যারা সেনা-আইনের অধীনে কোনো অপরাধের জন্য আনুষ্ঠানিক বিচারে দোষী কিংবা নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছেন বা হবেন দ্বিতীয়বার একই অপরাধের জন্য কোনো সামরিক বা বেসামরিক আদালতে তাঁদের বিচার করা যাবে না। এমনকি সেনা-আইনের ২৩ ধারায় আনুষ্ঠানিক সংক্ষিপ্ত বিচারেও যদি কেউ লঘু শাস্তি (সতর্ক করে দেয়া, জ্যেষ্ঠতা হরণ ইত্যাদি) পেয়ে থাকেন তা হলে দ্বিতীয়বার ওই অপরাধের জন্য আর তাঁকে

কোনোরকম বিচারের সম্মুখীন করা যাবে না। ফলে প্রশ্ন জাগছে—তা হলে সামরিক বাহিনীর সদস্যদের আর বেসামরিক বিচার থেকে দায়মুক্তির প্রয়োজন আছে কি?

তার পরও যদি অধ্যাদেশের মাধ্যমে সেনাসদস্যদের দায়মুক্ত করা হয় তা হলে প্রশ্ন জাগতে পারে, কর্তৃপক্ষের কি এই সন্দেহ আছে যে, সামরিক বাহিনীতে তাদের নিজস্ব আইনে অভিযুক্তদের বিচার হবে না? অথবা তাদের মনোনীত আনুষ্ঠানিক বিচারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত সামরিক অধিনায়কগণ অভিযুক্তদের বিচারের দায়িত্ব পালন করতে অনাগ্রহী? এমন উদ্বেগ থেকেই কি সরকার বেসামরিক আদালতের বিচারপ্রক্রিয়া থেকে অভিযুক্ত সেনাসদস্যদের দূরে রাখতে চাইছেন?

বিগত দিনে দেখা গেছে, সামরিক বাহিনীতে কারণে-অকারণে আনুষ্ঠানিক বিচার বা অনেক সময় কারণ দর্শানো ছাড়াই সেনা-আইনের ১৮ ধারায় প্রশাসনিক ব্যবস্থায় সময় হওয়ার আগেই অবসর বা চাকরিচ্যুত করা হয়। এই ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্টরা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পায় না। কিন্তু এই ধারায় যাদের প্রশাসনিকভাবে শাস্তি দেয়া হয় কোনো আদালতে তাদের বিচারে বাধা নেই। এখানে সেনা-আইনের ৯০ ধারা প্রযোজ্য নয়।

প্রশ্ন জাগতে পারে—তা হলে যৌথ অভিযানে অভিযুক্ত সেনাসদস্যদের কি ১৮ ধারার ক্ষমতাবলে অবসর বা চাকরিচ্যুত করা হচ্ছে বা হবে? আর তাদের বেসামরিক বিচার থেকে রক্ষা করতেই কি দায়মুক্তি অধ্যাদেশ? যদি এমনটি হয় তবে তা সামরিক বাহিনীর রীতিনীতি শৃঙ্খলার পরিপন্থি। সরকারের উচিত এ-বিষয়ে জনগণকে খোলাখুলিভাবে অবহিত করা, যাতে সামরিক বাহিনী সম্পর্কে জনসাধারণের মনে আস্থার অভাব দেখা না দেয়।

এ-অবস্থায় আমি মনে করি, এই অধ্যাদেশটি অপ্রয়োজনীয়। যৌথ অভিযানকালে যাদের বিরুদ্ধে বেআইনি কর্মকাণ্ডের অভিযোগ উঠেছিল সেনাবাহিনীর প্রচলিত আইনে তাদের আনুষ্ঠানিক বিচার করা হোক। এ-বিচারপ্রক্রিয়ায় অভিযুক্ত ও অভিযোগকারী দুপক্ষকেই সমান সুযোগ দিতে হবে এবং তা হতে হবে প্রকাশ্য, সেনা-আইনেই যার অনুমোদন আছে।

সবশেষে বলব, সামরিক নীতি ও রাজনীতি একটা দেশের অবিচ্ছেদ্য উপাদান এবং একে অন্যের প্রতিচ্ছায়া। তারা একে অন্যের ওপর নির্ভরশীলও বটে। একটির ব্যর্থতা অন্যটিকে প্রভাবিত করে। যদিও এই সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য এবং আন্তঃনির্ভরশীল তবুও তাদের পৃথক রাখাই উচিত। আর খেয়াল রাখতে হবে কোনো কারণে রাজনীতি ও সামরিক বিষয়াদি যাতে একে অন্যের ওপর কোনো বিষয়ে এমনভাবে প্রভাব বিস্তার না করে, যার জন্য একের ব্যর্থতার দায়দায়িত্ব অন্যের ওপর না পড়ে।

*প্রথম আলো* ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

# স্বাধীনতা গন্তব্য ছিল না ছিল জাতির যাত্রার প্রারম্ভ

আমরা মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলাম কোনো রাজনৈতিক কারণে বা রাজনীতি দিয়ে প্রভাবিত হয়ে নয়। বাঙালিদের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানিদের শোষণ, নির্যাতন, নিপীড়ন দেখে যুদ্ধে গিয়েছিলাম। আমরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সবদিক দিয়ে ভালো পেশাগত ভবিষ্যৎ বিসর্জন দিয়ে স্বেচ্ছায় যুদ্ধে গিয়েছিলাম। ধারণা ছিল, ৩ থেকে ৫ বছরের মধ্যে হয়তো আমরা স্বাধীনতা অর্জন করব। এ যুদ্ধে ভারত আমাদের সহযোগিতা করবে, এটা আমরা ভালোভাবে উপলব্ধি করতাম। কারণ ভারত তার নিজের স্বার্থে পাকিস্তান ভাঙার জন্য এটা করবে। একটা কথা প্রচলিত আছে, শত্রুর শত্রু আমার বন্ধু। ইতিহাসের পাতা উল্টালে এ রকম শত শত উদাহরণ দেখা যায়।

যাহোক ভারতের সক্রিয় সহযোগিতায় আমরা নয় মাসে স্বাধীনতা অর্জন করেছি। একজন সামরিক অফিসার হিসেবে ওই সময়ের পাকিস্তানের সামরিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে বলতে পারি, ভারতের সক্রিয় সহযোগিতা যদি নাও থাকত তাহলেও আমরা ২ থেকে ৩ বছরের মধ্যে দেশ স্বাধীন করতে পারতাম। স্বাভাবিকভাবে সর্বপ্রথম প্রত্যাশা ছিল একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ পাব। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রথম মিশন ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও শাসকদের সামরিকভাবে পরাজিত করে বাংলাদেশকে মুক্ত করা। একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। সে রাষ্ট্রের রূপরেখা ও সমাজব্যবস্থা কীভাবে পরিচালিত হবে সেটা ঠিক করবে বাংলাদেশের জনগণ। অবশ্যই জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হয় নির্ভেজাল গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। সেখানে থাকবে জনগণের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা, ন্যায়বিচার এবং শোষণমুক্ত ও ভয়-ভীতিহীন সমাজব্যবস্থা।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর নিয়ন্ত্রণহীন উল্লাস ও আবেগের তাড়নায় আমাদের রাজনীতিবিদ ও সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র শুধু দেশের স্বাধীনতা অর্জনকে গন্তব্য বলে ধরে নিয়েছিল। অথব উচিত ছিল স্বাধীনতাকে একটি জাতি

হিসেবে আমাদের যাত্রার প্রারম্ভ হিসেবে বিবেচনা করা। আরো উদ্যোগ-উদ্দীপনা নিয়ে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করা। সে জন্য প্রয়োজন ছিল দূরদর্শী আত্মত্যাগী নেতৃত্ব।

আমার মনে হয়, সেই মুহূর্ত থেকে আমরা দেশ গড়ায় এবং দেশ পরিচালনায় লক্ষ্যচ্যুত হই। আমাদের তৎকালীন রাজনীতিবিদগণ সরকার ও প্রশাসন পরিচালনায় ছিলেন অনভিজ্ঞ। রাজনীতিবিদ ও তাদের উপদেষ্টারা পুরোপুরিভাবে নির্ভরশীল ছিলেন আমলাদের ওপর। আমলারাও ছিলেন প্রশাসন পরিচালনায় দুর্বল ও অনভিজ্ঞ। দেশ পরিচালনায় তাদের জ্ঞান ছিল বেশিরভাগই তাত্ত্বিক। একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অর্থনীতি, সামাজিক ব্যবস্থা ও অন্যান্য কাঠামো কীভাবে গড়ে তুলতে হয়, সে সম্পর্কে তাদের ছিল না কোনো বাস্তব অভিজ্ঞতা। এ কারণে দেশ নিয়ে চলে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা; যা দেশকে ঠেলে দেয় আরো সঙ্কটের দিকে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন-পরবর্তী ৩৪ বছরকে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে চার ভাগে ভাগ করতে পারি। কোনো ধাপেই আমরা আশাতীত সাফল্য অর্জন করতে পারি নি। প্রথম ধাপ '৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে '৭৫ সালের আগস্ট। গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র দিয়ে শুরু হওয়া শাসনব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত একদলীয় ব্যবস্থায় রূপ নেয়। এ সাড়ে তিন বছরের শাসনে আমরা দেশ পরিচালনায় লক্ষ্য নির্ধারণে ব্যর্থ হই।

'৭৫-এর আগস্ট থেকে '৮২-এর মার্চ পর্যন্ত দ্বিতীয় ধাপের এ সময় সামরিক বাহিনীতে উচ্ছৃঙ্খলতা ও অস্থিরতায় দেশ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে চলে যায়। দুজন রাষ্ট্রপতি সামরিক বাহিনীর হাতে নিষ্ঠুরভাবে মৃত্যুবরণ করেন। এটা আমাদের জাতির জন্য কলঙ্কজনক অধ্যায়। এ সময় সামরিক বাহিনীর এ উচ্ছৃঙ্খলতা ও অস্থিরতা মূলত সামরিক বাহিনীকে সঠিকভাবে পরিচালনায় ব্যর্থতা। এর দায় সেনা নেতৃত্ব ও রাজনীতিবিদদের নিতে হবে। এ কারণে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইনস্টিটিউশনগুলো গড়ে উঠতে পারে নি। এর ফলে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়।

'৮২ সালে একজন উচ্চাভিলাষী সেনাপ্রধান একজন নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে সরিয়ে মার্শাল ল জারি করেন। পরে গণতন্ত্রের মুখোশ নিয়ে নয় বছর দেশ শাসন করেন। তার সঙ্গে কিছু সুবিধাভোগী রাজনীতিবিদও যোগ দেন। সে সময় দেশে শুরু হয় সীমাহীন দুর্নীতি। এ দুর্নীতি রাজনীতিসহ সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে ক্যান্সারের মতো। তৎকালীন ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা হয়ে ওঠেন আর্থিকভাবে প্রবল প্রতাপশালী। দেশের উন্নয়নের নামে ব্যাপকভাবে সরকারি অর্থের অপচয় ঘটে। আর উন্নয়নের নামে যা হয়েছে, তাকে এক কথায় বলা যায় শহরকেন্দ্রিক কসমেটিক ডেভেলপমেন্ট।

১৯৯১ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছে। কিন্তু প্রত্যাশিত সুস্থ রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত হয় নি। সংসদীয় গণতন্ত্রের নামে চলছে

দেশে ব্যাপক অস্থিরতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা। আছে সীমাহীন দুর্নীতি আর সর্বক্ষেত্রে সুশাসনের অভাব। জনগণ 'গণতান্ত্রিক' এ প্রক্রিয়ায় মোটেও সম্পৃক্ত নয়; যদিও আপামর জনগণের নামেই দেশ শাসন চলছে। মুক্তিযুদ্ধের প্রারম্ভে কিংবা তৎপরবর্তী সময়ে স্বাধীন বাংলাদেশের এ বেহাল অবস্থা মনে হয় দুঃস্বপ্নের মতো।

একটি দেশের উন্নতি বা অবনতির ক্ষেত্রে কিছু পূর্বশর্ত থাকে। সেগুলো বিবেচনায় না রেখে সব রকম অস্থিরতাকে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হিসেবে দেখা ঔপনিবেশিক মানসিকতা। আইন-শৃঙ্খলা নির্ভর করে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, সমাজব্যবস্থা, মূল্যবোধ, আইনের সমান ও যথাযথ প্রয়োগ, ন্যায়বিচার এবং সরকার পরিচালনায় জনগণের সম্পৃক্ততা ও স্বচ্ছতার ওপর। বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে এগুলোর সবকিছুর অভাব আছে।

আমাদের সমাজে দিন দিন বিশ্বায়নের নামে ধনী-গরিবের ব্যবধান বাড়ছে। দেশে অসংখ্য এনজিওর উত্থান এবং এদের লাভের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে দারিদ্র্য কমছে না। বরং দিন দিন মধ্যবিত্তের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। যারা দেশকে মৌলিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে রেখেছেন, স্বাধীনতা যুদ্ধে তারাই নেতৃত্ব দিয়েছিল। দেশ পরিচালনায় সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিল। সর্বশেষ এক পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে মধ্যবিত্তের সংখ্যা এখন কমে মাত্র ৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। তুলনামূলকভাবে ভারতে এ সংখ্যা ৩০ শতাংশের ওপর। অথচ এই মধ্যবিত্তরাই সমাজ ও দেশ গঠনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তাদের ত্যাগই সবচেয়ে বেশি।

সাম্প্রতিক একটি বিষয় এখানে আলোচনা করা দরকার। বর্তমানে দেশে জঙ্গিবাদী তৎপরতা নিয়ে সর্বমহলে আলোচনা হচ্ছে। মনে হয়, সরকারও এ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। জঙ্গিবাদী কার্যকলাপ নিয়ে আমি আগেও বলেছি, এর মূল কারণ অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যকলাপ। যারা বিপথগামী হয়েছে তাদের বেশিরভাগই হতদরিদ্র বেকার। তাদের মূল ধারায় ফিরিয়ে আনতে হলে শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে এ রকম বিভিন্নমুখী অস্থিরতা চলতে থাকবে। এদের রাজনৈতিক ও অসমাজিক কর্মকাণ্ডের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হবে। এমনকি বাইরে বাংলাদেশের শত্রুরাও দেশকে অস্থিতিশীল করতে এদের কাজে লাগাতে থাকবে।

আরেকটি বিষয়ে পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। আমরা জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার এবং ঘৃণা পোষণ করছি। ঠিক একইভাবে আমাদের উচিত হোয়াইট কলার বা ভদ্রবেশী অপরাধীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া। যারা দেশের সম্পদ লুটপাট করছে, যাদের ব্যক্তিগত লোভ ও লাভের জন্য শত শত শ্রমিককে কর্মক্ষেত্রে প্রাণ হারাতে হচ্ছে, এদের বিরুদ্ধে একইভাবে ঘৃণা প্রকাশ করা ও সোচ্চার হওয়া উচিত। আমি মনে করি, যারা দেশের জনগণের সম্পদ লুট করে ধনী হচ্ছে, তারাও দেশদ্রোহী।

আমাদের দুর্ভাগ্য, দেশে সঙ্কট বাড়ছে। একটি শেষ না হতেই আরেকটি আসছে। এ সঙ্কটগুলো নিয়ে পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ বা সমস্যাগুলোর স্থায়ী সমাধানের কথা ভাবতে পারছি না। সবকিছু করা হচ্ছে 'অ্যাডহক' ভিত্তিতে। ফলে মূল সঙ্কট থেকেই যাচ্ছে। মনে হয়, আমরা যেন সঙ্কটের জালে আটকা পড়ছি।

আমি যখন স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম, তখন আমার বয়স ছিল ত্রিশের নিচে। এখন জীবন সায়াহ্নে এসে বাংলাদেশের গড় আয়ুর কথা বিবেচনায় নিলে, দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করলে শিউরে উঠি। যুদ্ধের মাঠে মৃত্যুর সাথে পথচলার ক্ষেত্রে সামান্যতম দ্বিধা ছিল না। বর্তমান বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করলে মনে হয় তখন যদি দেশের পরিস্থিতি এরকম হবে, তা স্বপ্নেও দেখতাম তাহলেও হয়তো যুদ্ধের মাঠে দ্বিধাগ্রস্ত হতাম।

*নয়াদিগন্ত* ২৬ মার্চ ২০০৬

# যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য ভারত ও পাকিস্তানের সহযোগিতা প্রয়োজন

হামুদর রহমান কমিশন গঠন করা হয়েছিল 'অযোদ্ধা' বাঙালি ও ভারতীয় বাহিনীর হাতে 'পরাক্রমশালী' পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পরাজয়ের কারণ খতিয়ে দেখার জন্য। তবে গোপন উদ্দেশ্য ছিল '৭১ সালে বাংলাদেশের ঘটনাবলির দায়দায়িত্ব পাকিস্তানের তৎকালীন ক্ষমতাসীন রাজনীতিকদের কাঁধ থেকে সামরিক বাহিনীর ঘাড়ে ফেলা। বাংলাদেশে গণহত্যা পরিচালনার পেছনে এই রাজনীতিবিদদের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া যুদ্ধের পর জেনারেল ইয়াহিয়া, জেনারেল হামিদ, জেনারেল গুলহাসান প্রমুখের নেতৃত্বে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সিনিয়র অফিসারদের মধ্যে গ্রুপিং শুরু হয়। এই কমিশন গঠনের আরেকটা উদ্দেশ্য ছিল এদের হেয় প্রতিপন্ন করা।

যাঁর নির্দেশে হামুদুর রহমান কমিশন গঠিত হয়েছিল, পাকিস্তানের তৎকালীন সেই প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলি ভুট্টোই ২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর গণহত্যা প্রত্যক্ষ করে ২৬ তারিখ করাচিতে গিয়ে বলেছিলেন, "আল্লাহর অশেষ রহমত, পাকিস্তান রক্ষা পেয়েছে।" তাই ভুট্টোর গঠিত হামুদুর রহমান কমিশন বাংলাদেশের গণহত্যার তথ্যপ্রমাণ নিয়ে মাথা ঘামাবেন না এটাই স্বাভাবিক। তবুও ফাঁকফোকর দিয়ে কিছু তথ্য বেরিয়ে এসেছে।

খুব বেশি না বলে একটি উদাহরণ দিয়েই এই সম্পূরক রিপোর্টের সারবত্তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী ২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় অপারেশন সার্চলাইট নামে গণহত্যা 'পরিচালনায়' পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন। কিন্তু সম্পূরক রিপোর্টে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগই আনা হয় নি। মূল রিপোর্ট যেটি প্রকাশিত হয় নি, তাতে বাংলাদেশের গণহত্যার তথ্যপ্রমাণ কতটুকু পাওয়া যাবে তা নিয়েও আমার সন্দেহ আছে। আর প্রাসঙ্গিকভাবে এলেও তা যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্য কতটুকু কার্যকর সে-প্রশ্ন থেকেই যায়।

জেনারেল রাও ফরমান আলির অধীনেই ৫৭ ব্রিগেডের কমান্ডার তৎকালীন ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব আরবাব (পরে ভুট্টো সরকারের অধীনে লে. জেনারেল) চারটি ইনফেন্ট্রি ব্যাটালিয়ান এবং এক কোম্পানি কমান্ডো, দুটি গোলন্দাজ বাহিনী নিয়ে ঢাকায় রাতের আঁধারে পরিকল্পিত গণহত্যা পরিচালনা করেন। কিন্তু সম্পূরক রিপোর্টে তাঁর বিরুদ্ধেও গণহত্যার কোনো অভিযোগ আনা হয় নি। তবে রিপোর্টে তাঁর নাম এসেছে অন্যভাবে। এই ব্রিগেডিয়ার ঢাকার অনতিদূরের জয়দেবপুর এলাকা পুরোটা ধ্বংস করে দেয়ার আদেশ দিয়েছিলেন। রিপোর্টের আর কোথাও কোনো পাকিস্তানি সিনিয়র সামরিক কমান্ডার বাংলাদেশের কোনো এলাকাকে সরাসরি গুঁড়িয়ে দেয়ার আদেশ দিয়েছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। জয়দেবপুরের প্রতি জাহানজেব আরবারের আক্রোশের কারণ ছিল। '৭১-এর ১৯ মার্চ থেকে শুরু করে ২৮ মার্চ পর্যন্ত জয়দেবপুর ক্যান্টনমেন্ট দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গলের বাঙালি অফিসার ও সর্বস্তরের সৈনিকদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। পাকিস্তানিরা কয়েকবার চেষ্টা করেও এই ছাউনি ও তৎসংলগ্ন এলাকা তাদের নিয়ন্ত্রণে নিতে পারে নি। ২৫ মার্চ এবং এর পরে দেশের বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তান বাহিনী বাঙালি পুলিশ, ইপিআর (বর্তমান বিডিআর) এবং সামরিক বাহিনীর অফিসার ও জওয়ানদের পরিকল্পিতভাবে হত্যা করেছিল। কিন্তু একমাত্র জয়দেবপুরে তাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। সেখানে তাদের প্রাণ হারাতে হয়েছিল বাঙালি সৈন্যদের হাতে। আমাদের নিখুঁত পূর্ব পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির জন্য একজন বাঙালিকেও প্রাণ দিতে হয় নি সেখানে। যুদ্ধের শুরুতেই জয়দেবপুরে তাদের পরাজয়ের হিংস্র প্রতিশোধ নিতেই পুরো জয়দেবপুর এলাকা ধ্বংস করে দেয়ার আদেশ দেন।

তো, হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্টই কিন্তু বাংলাদেশে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পরিকল্পিত গণহত্যার প্রথম ও একমাত্র দলিল নয়। ১৯৭৩ সালে পাকিস্তানে জুলফিকার আলি ভুট্টো সরকারকে উৎখাত-প্রচেষ্টার অভিযোগে কয়েকজন মেধাবী সামরিক অফিসারকে রাওয়ালপিণ্ডির অদূরে 'আটক ফোর্ট'-এ কোর্ট মার্শাল করা হয়। ১৯৭৬ সালে আমি যখন লন্ডন দূতাবাসে জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থার অফিসার হিসেবে কর্মরত, তখন আমার হাতে ওই কোর্ট মার্শালে দেয়া অভিযুক্ত দুজন অফিসারের বিস্তারিত জবানবন্দি আসে। ২৫-৩০ পৃষ্ঠার সেই জবানবন্দির কপি আমি সে-সময়ই বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দিই। এদের একজন মেজর ফারুক আদম এবং অন্যজন ক্যাপ্টেন সেলিম মালিক। এঁরা দুজন ছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নামকরা (যথাক্রমে) জেনারেল আদম ও আখতার মালিকের ছেলে।

তাঁদের দুজনের, বিশেষ করে ক্যাপ্টেন সেলিম মালিকের বক্তব্যের প্রায় দুই পৃষ্ঠা জুড়ে ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ। এ-জবানবন্দিতে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে আনা ভুট্টোকে উৎখাতের ষড়যন্ত্রের অভিযোগের জবাবে নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরের করুণ চিত্র তুলে ধরেন।

সেখানেই তিনি বাংলাদেশে পাকিস্তানের শোচনীয় পরাজয় প্রসঙ্গ টেনে বলেন, "যুদ্ধের নামে জেনারেলসহ সিনিয়র সামরিক অফিসাররা সেখানে (বাংলাদেশে) দুর্নীতি, লুটপাট, নারীধর্ষণ এবং হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল। এসব বিষয়ই আমরা জুনিয়র অফিসাররা আলাপ-আলোচনা করেছি। সেই কারণে আমাদের বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছে।"

প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয়, এই কোর্ট মার্শালের প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করা হয়েছিল তৎকালীন মে. জেনারেল জিয়াউল হককে। বিচার চলাকালে ক্যাপ্টেন মালিক জে. জিয়াউল হককে বিচারকের আসন ছেড়ে তাঁদের সঙ্গে শামিল হয়ে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান। এই কোর্ট মার্শালের মাধ্যমেই জিয়াউল হক লাইম লাইটে আসেন এবং পরে ভুট্টোকে উৎখাত করে পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন।

হামুদুর রহমান কমিশন নিয়ে এখন বেশ আলোচনা চলছে। পাকিস্তানের কাছে আমরা এই রিপোর্ট চাচ্ছি তাদের বিচার করার জন্য। তারা যে সেটা দেবে না ইতোমধ্যে তেমন আভাসও পাওয়া গেছে। কিন্তু আমাদের উচিত ছিল স্বাধীনতার পরপর নিজেরা কমিশন বসানো। প্রয়োজনে বিদেশ থেকে এ-কাজে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ, ফরেনসিক বিশেষজ্ঞের সহায়তা চাওয়া যেত। এখানে গণকবর পাওয়া গেছে, ওখানে বধ্যভূমি পাওয়া গেছে, এই এলাকায় গণহত্যা হয়েছে— এরকম কিছু ভাসাভাসা বিষয় আমরা সাধারণ লোকজন জানি। কিন্তু কোন এলাকায়, কার নির্দেশে, কাদের মাধ্যমে গণহত্যা হয়েছে বা বাংলাদেশের কারা এ-ব্যাপারে সহায়তা করেছে, সুনির্দিষ্টভাবে আমাদের অনেকেই তা জানেন না। কোথাও বসে যে আমরা অভিযোগ করব এই নৃশংসতা হয়েছে, অমুক জেনারেল করেছে, অমুক কর্নেল করেছে, তার সাক্ষ্যপ্রমাণ আমাদের হাতে আছে কি? এজন্যই আমাদের একটা নিজস্ব কমিশনের প্রয়োজন ছিল।

মনে পড়ে, ১৯৭২ সালে আমাকে বলা হলো কিছু যুদ্ধবন্দি রাখার জন্য জায়গার ব্যবস্থা করতে। ঢাকা সেনানিবাসে আমার তত্ত্বাবধানে দুটি ক্যাম্প বানানো হয়েছিল। সেনাসদরে আলাপ-আলোচনা শুরু হলো যে, কিছু যুদ্ধাপরাধীর বিচার হবে বাংলাদেশের মাটিতে এবং তাদের ভারত থেকে আনা হবে। কাগজপত্রও কিছু বোধ হয় তৈরি করা শুরু হলো। তারপর আর তেমন কিছু হলো না।

আসলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না হওয়ার জন্য আমরাও সমানভাবে দায়ী। বাংলাদেশ সরকারের উচিত ছিল আত্মসমর্পণের পর থেকে সিমলা চুক্তি পর্যন্ত আরও সক্রিয় থাকা। পাকিস্তানিদের দূরের কথা, আমরা বাংলাদেশী ঘাতক ও দালালদেরও বিচার করতে পারি নি ৩০ বছরে। এর কারণ একে রাজনীতিকীকরণ করা হয়েছে। আমরা দালালির জন্য শুধু নির্দিষ্ট রাজনীতিকদের চিহ্নিত করেছি। কিন্তু সরকারি কর্মকর্তা যারা স্বেচ্ছায় পাকিস্তানের হয়ে কাজ করেছে, তাদের

চিহ্নিত করা হয় নি। আর্মি ছাড়া বেসামরিক কোনো কর্মচারীর এর জন্য চাকরিও তো যায় নি। এদের অনেককেই আমরা চিনি। অনেকে পরে সরকারের বড় বড় পদে বসেছেন এবং আমাদের দেশপ্রেমের বুলি শুনিয়েছেন।

তাই পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য আগে আমাদের বিশুদ্ধ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। আমাদেরই সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমরা কী করব। আমরা দুরকম বিচার চাইতে পারি। একটা প্রতীকী বিচার। অন্যটা অর্থবহ বিচার। প্রতীকী বিচার করতে চাইলে হয়তো পাকিস্তান সানন্দে রাজি হয়েও যেতে পারে। নিয়াজি এল, দুএকটা শুনানি হলো, চলে গেল। তো, এই ধরনের বিচার অন্তত আমার কাছে গ্রহণযোগ্য বা অর্থবহ নয়। কারণ আমি নিজে ভুক্তভোগী। শহরে গ্রামে আমার বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। এ-নৃশংসতায় আমার মা তার স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। তাই যাঁরা ভুক্তভোগী তাঁদের কাছে প্রতীকী বিচারের কোনো অর্থ নেই। এটা আমাদের রাজনীতিবিদদের কাছে অর্থবহ হতে পারে।

আর অর্থবহ বিচারের জন্য আমাদের সামনে দুটো পথ খোলা আছে। একটা হলো সরাসরি পাকিস্তানকে অনুরোধ করা যুদ্ধাপরাধে জড়িত তাদের নাগরিকদের বিচার করার জন্য। আমি মনে করি, সেটা তারা সহজে করতে পারে, যদি তাদের সদিচ্ছা থাকে। তাদের কাছে কিছু প্রমাণ নিশ্চয়ই আছে। তা ছাড়া অপরাধের সঙ্গে জড়িত লোকজন সবাই তাদের হাতের কাছে। হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্টে প্রসঙ্গক্রমে হলেও যারা যুদ্ধাপরাধ করেছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে, সেসব সামরিক কর্মকর্তা ছাড়া আরও যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে বিভিন্ন সময় পাকিস্তানি লেখকদের বিভিন্ন লেখায়, বা সেই ১৯৫ জন সামরিক অফিসার যাদের যুদ্ধাপরাধী হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছিল—তাদের তারা বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারে। কাঠগড়ায় এনে তাদের এবং তাদের সহযোগীদের জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে একটা অর্থবহ বিচার-অনুষ্ঠান পাকিস্তানের পক্ষে করা সম্ভব। তাদের সদিচ্ছা থাকলে এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশও তাদের তথ্যপ্রমাণ দিয়ে সহায়তা করতে পারে।

তাই আমাদের সরকারের উচিত এই বিষয়টি নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা করা। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বাংলাদেশের কাছে ক্ষমা চাইতে পারে। এটা করলে আমাদের সম্পর্ক উন্নত হবে। প্রশ্ন হচ্ছে, পাকিস্তান সেটা করবে কি না।

আরেকটা পথ হলো আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিষয়টি উত্থাপন করা। সেটার জন্য আমাদের সরকারের কাছে তথ্যপ্রমাণ কতটুকু আছে আমি জানি না। আমি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল ছিলাম। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কাছে এ-ধরনের কোনো প্রমাণ আছে বলে আমি দেখিনি। কারণ সরকারিভাবে তথ্যপ্রমাণ জোগাড় করার কোনো প্রচেষ্টাও চালানো হয় নি। কিন্তু আন্তর্জাতিক আদালতে গেলে আমাদেরকে বিচারের জন্য নির্দিষ্ট লোককে চিহ্নিত করতে হবে। অভিযোগের পক্ষে অক্যাটা প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে। গড়পড়তা অভিযোগ

তুলে সেখানে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করানো কষ্টকর। সেজন্য আমাদের কার্যকর প্রস্তুতি দরকার।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হিটলারসহ তাঁর অধীনস্থ বিভিন্ন কমান্ডার, এমনকি মিলিটারি পুলিশের ক্যাপ্টেনের পর্যন্ত বিচার হয়েছে। কারণ তাদের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণের মতো কাগজপত্র যুদ্ধের পর থেকেই তৈরি করা হয়, প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়। ফলে আজও বিচার সম্ভব হচ্ছে। আবার ভিয়েতনামের মাইলাই হত্যাকাণ্ডের জন্য ক্যাপ্টেন ক্যালিকে অভিযুক্ত করে তাঁর বিচার করা হয়েছে। কিন্তু তার কামান্ডারকে অভিযুক্ত করা যায় নি। কারণ তদন্তে দেখা গেছে, তিনি হত্যাকাণ্ডের আদেশ দেন নি। বাংলাদেশে অনেক মাইলাই হয়েছে। যুদ্ধের ৯ মাসে আমি নিজে আমার অপারেশন এলাকায় অন্তত বিশটা গ্রাম জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেয়ার ঘটনা দেখেছি। মেজর, ক্যাপ্টেন বা তার নিচের স্তরের অফিসাররাও নৃশংসতা চালিয়েছে। প্রতীকী বিচারে ওরা পার পেয়ে যাবে। একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং একজন সৈনিক হিসেবে আমি চাইব অর্থবহ বিচার হোক। তার জন্য যা যা প্রায়োজন, যেমন সাক্ষ্যপ্রমাণ জোগাড় করা, অপরাধীদের চিহ্নিত করা–করতে হবে। দেরিতে হলেও সরকারের উচিত এখনই পরিকল্পনা নিয়ে শুরু করা।

এখন পর্যন্ত আমাদের মতে, আমাদের হাতে গণহত্যার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হচ্ছে অপারেশন সার্চলাইট অর্ডার। নিরস্ত্র বেসামরিক লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা একটি অপরাধ। তাই এই অপারেশন অর্ডার ইটসেলফ ইজ আ ক্রাইম।

এই যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ক্ষেত্রে ভারত আমাদের জন্য একটা বড় সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে। ভারতে যে ১৯৫ জন পাকিস্তানিকে বিচারের জন্য ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত যুদ্ধবন্দি হিসেবে রাখা হয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে ভারতের হাতে নিশ্চয়ই অনেক তথ্যপ্রমাণ ছিল। কারণ ৯৩ হাজার যুদ্ধবন্দির মধ্যে শুধু এদেরই শনাক্ত করা হয়েছিল। তখন বলা হয়েছিল এদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আছে। নিশ্চয়ই এর জন্য তাদের কোনো তদন্ত করতে হয়েছে। অবশ্য আমরা এখন পর্যন্ত জানি না যে, সেরকম কোনো তদন্ত রিপোর্ট ভারতের হাতে আছে কি না। যদি থেকে থাকে তা হলে বাংলাদেশ সরকারের উচিত তা সংগ্রহ করা এবং আন্তর্জাতিক আদালতে গেলে ভারতকে এ-ব্যাপারে সহযোগিতা করতে রাজি করানো। তাই আমি বলব, আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ ট্রাইবুনালের মাধ্যমে বিচারের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য ও তথ্যপ্রমাণের জন্য আমাদের ভারত ও পাকিস্তানের সহযোগিতা প্রয়োজন। এ ছাড়া যুগশ্লাভিয়া, বসনিয়া ও কসোভো ট্রায়ালের বিশেষজ্ঞদের মতামত নিতে পারি আমরা। এসব সত্ত্বেও সবশেষে আমাকে বলতে হচ্ছে, বড় বেশি দেরি হয়ে গেছে।

*প্রথম আলো* ২ সেপ্টেম্বর ২০০০